পড়াশোনায় মনোযোগ সৃষ্টির উপায়

ভাল ছাত্র হওয়ার কৌশল কি?

পড়া মনে থাকবে কিভাবে?

আমি কি ভাল ছাত্র হতে পারবো?

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
(আলোচক, পিস টিভি বাংলা)

আদর্শ

আব্দুল হামীদ মাদানী

সফলতার হিমালয়-চূড়াকে
যারা পদদলিত করতে চায়,
আমার স্নেহভাজন ও দুআর পাত্র
সেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে।

সূচীপত্র

প্রারম্ভিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। পৃথিবীতে তাকে সুখী করার জন্য জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন। তাতে রয়েছে নানামুখী রীতি-নীতি, আইন ও কানুন। সেই বিধানে মানুষের জন্য প্রথম ফরযঃ জ্ঞান শিক্ষা। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণকৃত আদেশ ঃ পড়।

মহান আল্লাহ মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না।

মুসলিম জাতির শিক্ষাই হল মেরুদন্ড। ইসলামের নবী ﷺ শিক্ষাকে ফরয করেছেন প্রত্যেক (নর ও নারী) মুসলিমের উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে ফরযকে গরজ মনে করেছে অধিকাংশ মুসলিম।

বিশেষ করে অমুসলিম প্রধান দেশগুলিতে মুসলিমদের শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা বলাই বাহুল্য। যে দেশে মুসলিমকে শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হতে হয়। ইসলামী মূল্যবোধ বহাল রেখে যেখানে শিক্ষা করা যায় না। চাকরির ক্ষেত্রেও যেখানে বর্ণ-বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সেখানে মুসলিমদেরকে শিক্ষার হাল নিজেই ধরতে হয়।

দারিদ্রের ফলে কত শত ছাত্র শিক্ষাঙ্গনে অগ্রসর হতে পারে না। কত শত প্রতিভার ফুল কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝরে পড়ে। কত শত মেধার কুঁয়া ব্যবহার না হওয়ার ফলে আপনা-আপনিই শুকিয়ে যায়। বুদ্ধির যথার্থ লালন না থাকার ফলে, প্রয়োজনে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ না পাওয়ার ফলে অকালেই নষ্ট হয়ে যায়। যথাসময়ে কর্ষণ, রোপণ, সিঞ্চন ও রক্ষণাবেক্ষণ না থাকার ফলে কত শত

মুসলিম উদ্ভাবনী বুদ্ধির কচি কিশলয় বড় হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে পারে না। আর তার জন্যই মুসলিম প্রাইভেট জনকল্যাণমূলক সংস্থা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োজন মুসলিম সমাজসেবী মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ উদ্যম ও উদ্যোগের। নচেৎ, 'পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে।'

আর সেই উদ্যোগ নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মিশন।

যেহেতু শিক্ষা ও বুদ্ধি বিকাশের ব্যাপারটা অনেকটা নির্ভর করে সঠিক পথনির্দেশ, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানের উপর, সেহেতু এই পুস্তিকা মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সেই পথের বড় সহায়িকা হবে বলে আমার আশা।

এ মর্মে যে সকল বই পুস্তকের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে মহাজাতকের 'সাফল্যের চাবিকাঠি' এবং 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত মওলানা আবূ সায়েম সাহেবের প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আল্লাহর কাছে দুআ যে, তিনি যেন প্রত্যেক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে আদর্শ ও সফল জীবন দান করুন এবং আমাদের সকলকে ইহ-পরকালের উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করুন আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
৬ জুন ২০০৬

একজন সফল ও আদর্শ ছাত্রের কর্তব্য

তুমি যদি চাও যে, তুমি একজন আদর্শ ও সফল কৃতিছাত্র হবে, তাহলে নিম্নোক্তের উপদেশমালা গ্রহণ কর ঃ-

(১) লক্ষ্য স্থির কর।

কি উদ্দেশ্যে লিখাপড়া করবে?

যদি কোন শিক্ষার্থী পড়ার জীবনে অর্থের চিন্তা করে এবং একটি ছোট্ট চাকরি পেলেই তার পড়াশোনা ছেড়ে দেবে বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার পড়াশোন আর হবে না। অর্থের চিন্তা-ভাবনা ও টাকা-পয়সা অর্জনের লোভই তার পড়াশোনার ইমেজ নষ্ট করে ফেলবে। এভাবে ছাত্র জীবনে যারাই অর্থের লোভে পড়বে এবং লোভকে সংবরণ করতে না পারবে, তাদের মানসিক টেনশন বৃদ্ধি পাবে, আর তাতে অধ্যয়নে চরম ব্যাঘাত ঘটবে এবং স্মরণ-শক্তির মারাত্মক ক্ষতি হবে। কেননা, Greed begins sin, sin begins death. অর্থাৎ লোভে পাপ, পাপেই মৃত্যু।

অতএব প্রত্যেক ছাত্রকে লোভ-লালসা, বাসনা-কামনা প্রভৃতি পার্থিব বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ছাত্র জীবন অর্থ ব্যয়ের জীবন এবং জ্ঞান অর্জনের সময়। তাকে অর্থ ব্যয় করে জ্ঞান অর্জন করতেই হবে এবং এ ব্যাপারে কার্পণ্য করা ঠিক নয়। তবে যারা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল তাদেরকে অবশ্যই হিসাব অনুযায়ী চলতে হবে।

বিশেষ করে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান তথা দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইখলাস রাখা জরুরী।

যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন শিক্ষা করে যার দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা কেবলমাত্র পার্থিব কোন সম্পদলাভের আশায় শিখতে রত হয়, তবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আহমাদ ২/৩৩৮, আবূ দাঊদ ৪/৭১)*

কর্মজীবনে কিছু একটা করতেই হবে। আর তাতে নিয়ত যেন নিছক দুনিয়াদারি না হয়। বরং জ্ঞান শিক্ষার প্রধান নিয়ত ও উদ্দেশ্য যেন এই থাকে যে, সে এর মাধ্যমে নিজের জীবন থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূর করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে, তাঁর দ্বীনের খিদমত করবে, দেশ ও জাতির সেবা করবে। অতঃপর চাকরি করা বা না করা যেন গৌণ বিষয় হয়। মুখ্য বা মূল উদ্দেশ্য যেন অর্থোপার্জন না হয়।

(২) মনছবি তৈরী কর।

মানুষের মস্তিষ্ক সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর এক আজব সৃষ্টি। এর নকল আবিষ্কার হল কম্পিউটার। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক সর্বাধুনিক কম্পিউটার অপেক্ষা কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন! বর্তমানে একটি কম্পিউটারের দাম যদি ৫০ হাজার টাকা হয়, তাহলে মানুষের ব্রেন-কম্পিউটারের দাম হচ্ছে কমপক্ষে ৫০০০ কোটি টাকা! এত বড় একটি মহামূল্যবান সম্পদ মানুষ মাথায় করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ সে অভিযোগ করে যে সে গরীব। আসলে এমন মানুষ তার কম্পিউটার সম্বন্ধে সচেতন নয়। সে এই আজব যন্ত্রের মূল্যায়ন করতে জানে না।

সাধারণ মানুষরা এই ব্রেনের মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। আর সফল প্রতিভাবানগণ ব্যবহার করেন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। *(সাফল্যের চাবিকাঠি ২৩পৃঃ)*

তোমার কাছেও আছে এমন একটি কম্পিউটার। তুমি যদি তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পার, তাহলে তুমিও একজন বড় ধনী, সফল, বিজ্ঞানী, খ্যাতিমান ও যশস্বী ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পার।

প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তার পশ্চাতে মানুষের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন কাজ পাগলের। তুমি যে পড়াশোনার কাজ আরম্ভ করেছ, নিশ্চয়ই তার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি কি, তা ঠিক করেছ কি?

জেনে রেখো যে, লক্ষ্য নির্ধারিত না করলে সফলতা লাভে সন্দেহ থাকবে।

গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট না হলে পথ চলতে বিরক্ত ও কষ্ট লাগবে।

লক্ষ্য ঠিক করলে অপর লোকেও তোমাকে সহযোগিতা করবে। পক্ষান্তরে লক্ষ্য স্থির না করলে কোন লোকের সহযোগিতা তুমি পাবে না।

লোকের ভিঁড় পার হওয়ার পর যদি তোমার লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং লোকেরা যদি বুঝতে পারে যে, তুমি তাদের অপর পাশে পার হয়ে সেটি অর্জন করবে, তাহলে অনায়াসে তারা তোমাকে তাদের দিকে ছুটে আসতে দেখে কিছু না বলতেই রাস্তা ছেড়ে দেবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার লক্ষ্য নির্ধারিত না থাকে, তাহলে লোকে তোমার জন্য রাস্তা ছাড়বে না। যেহেতু তারাও জানে না যে, তোমার লক্ষ্যটি কি?

মোট কথা তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? তুমি কত বড় ও কি হতে চাও? তার একটা নীল নকশা প্রস্তুত করে মনের মানসপটে এঁকে নাও। তুমি যত বড় হতে চাও, তার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত থাক তোমার মনের পর্দায়। পরিকল্পনা বা প্ল্যান-এস্টিমেট তৈরী হয়ে থাকুক তোমার হৃদয়ের কোঠাতে। মনের মুকুরে সেই ছবি বারবার দেখতে থাক, যা তুমি হতে চাও।

আর জেনে রেখো যে, তোমার ব্রেন-কম্পিউটার সেই মনছবিকে বাস্তবে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর থাকবে। তুমি যে আশা ও পরিকল্পনা করে তোমার কাজ শুরু করেছ, তা তোমার ব্রেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে। মনছবিই তোমাকে তোমার সাফল্যের পথ বলে দেবে।

অবশ্য মনছবির বাস্তবতার জন্য লক্ষ্য স্থির; সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

যে লক্ষ্য তুমি স্থির করেছ, তা যুক্তিযুক্ত ও সম্ভাবনাময় হতে হবে এবং তার যৌক্তিকতায় ও সম্ভাবনাময়তায় পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

লক্ষ্য অর্জনের পথে পূর্ণ অনুভূতি ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

মনছবিই তোমাকে বলে দেবে তুমি কি করবে। সেই তোমাকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে অন্ধের যষ্ঠির মত কাজ করে যাবে।

মানুষের মন অনুযায়ী মহান সৃষ্টিকর্তা ফল দিয়ে থাকেন। মানুষ যে নিয়ত করে, সে নিয়ত অনুযায়ী তার কর্মের ফলাফল প্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَسَــنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} (١٤٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তা হতে প্রদান করব। আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। *(সূরা ইসরা' ১৯ আয়াত)*

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٣٩) سورة النجم

অর্থাৎ, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। সে আমাকে ভালো ধারণা করলে ভালো পাবে। আর মন্দ ধারণা করলে মন্দ পাবে। *(সহীহুল জামে' ১৯০৫নং)*

হযরত হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ পরলোক সুখময় করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে সে পারলৌকিক সুখ লাভ করে। আর যে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তবে সেটাই তার প্রাপ্য অংশ হয়। (পরলোক সে লাভ করতে পারে না)।' *(দারেমী ১/৭০)*

বাংলা প্রবাদেও দু-একটি কথা আছে, যা ফেলবার নয়। বলা হয়, 'যে যা ধায়, সে তা পায়।' 'যে খায় চিনি, তারে যোগায় চিন্তামণি।' ইত্যাদি। এর অর্থ হল, লক্ষ্য ঠিক রেখে কাজ করে গেলে সেই লক্ষ্য অর্জন হয়। সৃষ্টিকর্তা তার সেই আশা পূরণ করে থাকেন।

'শিখিব পড়িব বড়লোক হব,
পর গলগ্রহ হয়ে কেন রব।
এরূপ প্রবল প্রতিজ্ঞা যার,
হন রহমান সহায় তার।'

আর এ জন্যই ইসলামে নিয়তের বড় গুরুত্ব রয়েছে। তুমিও তোমার নিয়ত ঠিক করে নাও। আশা করলে তোমার মনছবিতে বড় আশা কল্পনা কর। মাদ্রাসা, স্কুল বা কলেজের আমি সেরা ছাত্র ও সবার চেয়ে ফার্স্ট হব, বড় ব্রেনী ও কৃতিছাত্র হব, সবার চাইতে বড় আলেম হব, বড় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হব, খ্যাতিমান বড় লেখক বা বক্তা হব, বড় চাকরি পাব ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে ছোট আশা করবে না, নিজেকে ছোট ভাববে না, নিজের অযোগ্যতা স্বীকার করবে না, হীনম্মন্যতার শিকার হবে না, হিম্মত উঁচু রাখবে, আত্মবিশ্বাস রেখে নিজের প্রতি আস্থা রাখবে, তাহলেই সফল হবে।

আশা বড় কর। তবে জেনে রেখো যে, আশা করলে তিনটি কাজ করতে হয়ঃ-

(ক) যার আশা করা হয়, তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও চরম লোভ থাকতে হয়।

(খ) তা না পাওয়ার আশঙ্কায় অথবা হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে মন ব্যাকুল থাকে।

(গ) তা অর্জনের পথে শত চেষ্টা জারী থাকে।

অন্যথা সে আশা দুরাশা।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩ নং)*

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجري على اليبس

পরিত্রাণ পেতে চাহ চল না সে পথে,
পানির জাহাজ কভু চলে না ডাঙ্গাতে।

পথে বাধা তো আসতেই পারে, বাধা উল্লংঘন করে অগ্রসর হতে হবে। নদীর মত এঁকেবেঁকে হলেও তোমাকে গন্তব্যস্থল সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

সর্বদা আশাবাদী হও, নিরাশাকে মনে স্থান দিও না। ইতিবাচক ধারণা ও কল্পনা কর। নেতিবাচক ধারণা ও কল্পনা থেকে সুদূরে থাক। খারাপ কিছু শুনলেও কুধারণা করো না; বরং সুধারণা কর এবং অমঙ্গলের আশঙ্কা না করে

মঙ্গলের আশা কর। অসচেতন অভিভাবক বা শিক্ষকের কোন নেতিবাচক মন্তব্য শুনে নিরাশ হয়ে যেও না। খবরদার ভাববে না, হয়তো ফেল হয়ে যাব, হয়তো সফল হব না, হয়তো ফার্স্ট্ হতে পারব না, হয়তো আমার ভাগ্য মন্দ, যদি চাকরি না পাই, যদি খরচ না যোগাতে পারি, হয়তো আমার আশা পূরণ হবে না, ইত্যাদি।

ক্লাশে প্রথম হওয়ার সাথে সাথে জীবনে প্রথম হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাও। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় তুমিই প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবে -এই বিশ্বাস রাখ। ভেবে দেখ, মাতৃজরায়ুতে ৪০ থেকে ৫০ কোটি শুক্রাণুর মধ্যে তুমিই প্রথম স্থান অধিকার করে ডিম্বাণুর বৃত্তের মধ্যে নিজের আশ্রয় তৈরী করে নিয়ে এ পৃথিবীর মুখ দেখতে পেয়েছ। অনুরূপ জীবন-সংগ্রামে তুমিই চেষ্টা করলে হতে পার কোটি কোটি মানুষের মাঝে অনন্য।

আর ভীরু-কাপুরুষের মত 'পারব না' বলো না। কারণ বিজ্ঞানীরা বলেন, 'আমি পারব' -এই দৃঢ় বিশ্বাসই সকল সাফল্যের ভিত্তি। তাঁরা মনে করেন, 'পারব' বলে বিশ্বাস করলে তুমি অবশ্যই পারবে।

'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচ জনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা
পারিব না বলে মুখ করিও না ভার।
একবারে না পারিলে দেখ শতবার।'
'পার কি না পার কর পরখ তাহার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

এক ছেলে মাদ্রাসায় পড়ত। যা পড়ত, তা মুখস্থ করতে পারত না। মুখস্থ করত আর ভুলে যেত। এতে সে মনে মনে খুব বিরক্ত হত। আফশোস করত আর দুঃখিত হত। একদিন সে আক্ষেপে মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু লিখাপড়া না করলে জীবন যে বৃথা। কোথায় যাবে, কি করবে সে?

মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরছিল। পথে পিপাসা লাগলে একটি কুঁয়ায় পানি খেতে গেল। সে কুঁয়াতলায় একটি পাথর দেখতে পেল। দেখল, পাথরটি ক্ষয় হয়ে খাল হয়ে গেছে। কারণ বিবেচনা করে জানতে পারল, কলসির ঘসা লেগে পাথরটি ক্ষয় হয়ে গেছে। ভাবল, মাটির কলসির ঘসা লেগে যদি পাথর ক্ষয় হতে পারে, তাহলে বারবার পড়া পড়ে আমার ব্রেন ক্ষয় হবে না কেন?

এ কথা খেয়াল করে সে নতুনভাবে পড়তে শুরু করল এবং পরবর্তীতে সে বড় বিদ্বান ও পন্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

ক্রমদীশ্বর দশ-বারো বছর পড়েও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তিলাভ করতে পারেননি। তখন অধ্যাপক 'তোমার কিছু হবে না' বলে তাঁকে বিদায় দিলেন। ক্রমদীশ্বর মনের ক্ষোভে আত্মহত্যা করবেন এই স্থির করে এক বনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পথে একটি বড় পুকুর দেখে তার পানিতে ডুবে মরার জন্য পাথর-বাঁধানো ঘাটের শেষ সিঁড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি পাথরের উপর একটি গর্ত দেখতে পেলেন। মহিলারা পানিভর্তি কলসী সেখানে রাখত। এইরূপ রাখতে রাখতে বহু বছর পর ঐ গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এ কথা বুঝে মনে মনে ভাবলেন, যদি আমিও বহুদিনব্যাপী চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সাথে ব্যাকরণ পাঠ করি, তাহলে নিশ্চয় পাথর ক্ষয় হওয়ার মত আমার ব্রেনও ক্ষয় হয়ে কাজ করবে। সুতরাং তিনি ফিরে গিয়ে নতুনভাবে অধ্যবসায় শুরু করে তিনি ব্যাকরণের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে এক ছাত্র পড়া মনে রাখতে না পারার ফলে তা ত্যাগ করার সংকল্প করার পর একদিন লক্ষ্য করল, একটি পিঁপড়ে একটি শস্যদানা নিয়ে একটি দেওয়ালে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু দূর উঠতেই সে দানাসহ পড়ে যাচ্ছে। বারবার চেষ্টার পর সেই পিঁপড়ে পরিশেষে সেই দানা নিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। তা দেখে সেই ছাত্র সংকল্পবদ্ধ হল যে, সেও অনুরূপভাবে পড়তে ও মনে রাখতে পারবে। সেও ভবিষ্যতে বড় বিদ্বানরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সূফী গায্যালীর জন্য কথিত আছে যে, ছোটবেলায় তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত

দুর্বল ছিল। তাই সবকিছু তিনি খাতায় নোট করে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন। একদা তিনি কোন মরুভূমিতে ডাকাতদলের পাল্লায় পড়লে তারা তাঁর খাতাগুলিও তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। তিনি পিছনে পিছনে ছুটে তাদের কাছে তাঁর খাতাগুলো ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তারা তাঁর সবকিছু নিক, কিন্তু তাঁর জ্ঞানভান্ডার যেন ফিরিয়ে দিক। এ কথা শুনে ডাকাত সর্দার বলল, 'যে জ্ঞান ডাকাতে ছিনিয়ে নিতে পারে, সে জ্ঞান দিয়ে কি হবে?' ডাকাতের এ কথা তাঁর মনে সুগভীর দাগ কাটে এবং তারপর থেকে তিনি আর খাতার উপর ভরসা না করে স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করেন। ফলে পরবর্তীতে তিনি উচ্চমানের স্মৃতিশক্তির অধিকারী হন।

জ্ঞানীদের পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং তোমাকেও তাঁদের মত পরিশ্রম করতে হবে। নচেৎ, 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

জেনে রাখ যে, মানুষের মনবলই হল প্রকৃত বল। এই মনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় কোন কিছুর ইচ্ছা, আশা, ভরসা, উৎসাহ, প্রেরণা, সাহস, স্পৃহা ও প্রতিজ্ঞা।

'তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা,
মনের অগ্রেতে বল যেতে পারে কেবা?'

সুতরাং মনোবলের মত অন্য বল তোমার শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে 'বল বল বাহুবল, জল জল বৃষ্টির জল' কথাটি ঠিক নয়। বরং এ ক্ষেত্রে 'বল বল মনোবল, জল জল যমযমের জল।' কথাই ঠিক।

যেহেতু মনোবল থাকলে তুমি সফল হবে এবং যমযমের পানি যে নিয়তে পান করবে, সেই নিয়ত তোমার পূরণ হবে।

'এই সংসার সুখের কুটী,
যার যেমন মন তেম্নি ধন, মনকে কর পরিপাটী।'

(৩) মনোযোগ দাও।

অধ্যয়নের সময় গভীর মনোযোগী হতে হবে, একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করতে হবে এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পড়তে ও শুনতে হবে। নচেৎ পড়ার সময় দ্বিমনা বা অন্যমনস্ক হলে পড়াটি মুখস্থ হবে না এবং মনে থাকবে না।

একদিকে টেবিলের সামনে বসে বই পড়বে, অন্য দিকে মনে মনে হরেক রকমের চিন্তা-ভাবনা করবে, এতে কোন লাভ হবে না।

পড়ার সময় মনোযোগ দিয়ে পড়। শিক্ষকের ব্যাখ্যা মনোযোগ দিয়ে শোন। কোন বিষয় জানা থাকলেও না জানার ভান করে গভীর মনোনিবেশের সাথে শ্রবণ কর।

মহান আল্লাহ নিজের বাণী কুরআন মনোযোগ সহকারে শুনতে আদেশ করেছেন। শোনার কানের সাথে মনের যোগ না দিলে শোনা বিষয় মনভূমিতে বদ্ধমূল হবে না। শোনার বীজ মনের মাটিতে সঠিকভাবে রোপিত না হলে, সোনার ফসল ফলবে কিভাবে? মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}

অর্থাৎ, এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে। *(সূরা ক্বাফ ৩৭ আয়াত)*

'বই পড়ে কিন্তু যে নাহি দেয় মন,
কেমনে সেজন বল, পাবে জ্ঞান-ধন?
প্রদীপে না দিয়ে তেল বাতি যদি জ্বালো,
কখনো কি সে প্রদীপ দিয়ে থাকে আলো?'

পড়াশোনায় মনোযোগ সৃষ্টির উপায়

(ক) যে কোন কাজের সাথে মনকে যোগ দিতে হলে মনকে অন্য কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এমনকি সেই সময় নিজের দেহ নিয়েও ব্যস্ত হওয়া চলবে না; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, গা চুলকানি, নাক খোঁটা প্রভৃতিও বর্জন করতে হবে। বর্জন করতে হবে ইন্দ্রিয়ের সকল কাজকর্ম।

মহান আল্লাহ তাঁর পঠিত বাণী মনোযোগ সহকারে শুনতে আদেশ করে বলেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (٢٠٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। *(সূরা আ'রাফ ২০৪ আয়াত)*

তার মানে কেবল কানে শুনলেই হবে না; বরং তার সাথে মনকে যোগ করতে হবে এবং কথাবার্তা বা অন্য কাজে ব্যস্ত না হয়ে চুপ থাকতে হবে। আর তবেই সেই বাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে এবং নেমে আসবে করুণার ধারা।

(খ) মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি কর। তার গুরুত্ব অনুধাবন করে সচেতনতা বৃদ্ধি কর। তোমার পড়াশোনার পশ্চাতে লক্ষ্য তো স্থির করেই ফেলেছ। এখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সচেষ্ট হও। কোন এক লোভকে সামনে রাখ। অবশ্য পরকালের লোভকে প্রাধান্য দাও। গাধার দড়ি ধরে টানলে যদি না আসে অথবা পিছন থেকে ধাক্কা দিলে না যায়, তাহলে তার সামনে মূলার মত কিছু লোভনীয় জিনিস উঠিয়ে ধর। দেখবে গাধা আপনিই চলতে শুরু করেছে। তোমার ইচ্ছার আসন নিয়ে মনের শকুনদল যদি আকাশের দিকে উড়তে না চায়, তাহলে উপর দিকে লাঠির ডগায় গোশ্‌ত ঝুলিয়ে দাও, তা দেখে খাবার লোভে শকুন উপর দিকে উড়তে শুরু করে দেবে। তেমনি তোমার মন যদি পড়াশোনায় অগ্রসর হতে না চায়, তাহলে সামনে রঙিন ভবিষ্যতের লোভ মনে জাগ্রত রাখ। শিক্ষা ও ইলমের মহিমা মনের মাঝে সদা জাগরূক রাখ।

শিক্ষা ও ইল্‌মের মহিমা

জেনে রেখো, শিক্ষিত হতে পারলে আল্লাহর একটি ফরয আদায় হবে এবং সজ্ঞানে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে। আর তা হলেই তোমার ইবাদত শুদ্ধ ও মকবূল হবে তথা আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হবেন এবং পরকালে বেহেশ্ত পাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।" *(সহীহুল জামে' ৩৯১৩নং)*

যে তাকওয়ায় বড় সেই আল্লাহর কাছে বড়। আর যার জ্ঞান বড় তার তাকওয়া বড়।

মহান আল্লাহর কাছে জ্ঞানীদের মর্যাদা আছে। তিনি বলেন,

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }

অর্থাৎ, "যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধ-শক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

{يرفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।" *(সূরা মুজাদিলাহ ১১ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করে থাকেন।" *(বুখারী ৭১নং মুসলিম ১০৩৭নং, ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর রসূল বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইল্‌ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোন এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদন করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন।

আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।” *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্‌ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নিঃসন্দেহে ফিরিশ্তাবর্গ ইল্‌ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী -এমনকি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, “আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।” অতঃপর তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ করে থাকে।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।) *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫নং)*

সাফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী ﷺ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লাল রঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি ইল্‌ম অন্বেষণ করতে এলাম।’ আমার এ কথা শুনে তিনি বললেন, “ইল্‌ম অন্বেষী (দ্বীন শিক্ষার্থী)কে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইল্‌ম অন্বেষীকে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেন। অতঃপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করে থাকেন।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইবনে মাজাহ (ভিন্ন শব্দে), সহীহ তারগীব ৬৮নং)*

তিনি বলেছেন, “পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।” *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

ইল্‌ম শিক্ষার এত কদর বলেই আমাদের সলফগণ আজীবন জ্ঞান অনুসন্ধান করে গেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি আপনি জানতে পারেন যে, আপনি আজ সন্ধ্যায় মারা যাবেন, তাহলে আপনি কি করবেন? বললেন, ‘মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি ইলম অনুসন্ধান করব।’

আসলে জীবনের ব্যাপক সময় ধরেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার কোন শেষ ও নির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই।

শিক্ষা ছাড়া কেউই জ্ঞান, সম্মান ও নিপুণতা লাভ করতে পারে না।

জ্ঞানেই আনন্দ, নির্জনতার সাথী, জীবনের বন্ধু।

জ্ঞান যার নেই, তার শক্তি ও সাহস বলতে কিছুই নেই।

সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল জ্ঞান, সবচেয়ে নিম্ন মানের দীনতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় নীচতা হল গর্ব এবং সবচেয়ে বড় বংশ হল সুন্দর চরিত্র।

বান্দার পক্ষে আল্লাহর সর্বোত্তম দান হল, জ্ঞান। তা না থাকলে, আদব। তা না থাকলে, মাল; যা মূর্খতা ও বেআদবীর ত্রুটিকে গোপন করে। তা না থাকলে, তার মরণ ভালো। যাতে তার ক্ষতি থেকে দেশ ও দশ নিরাপদে থাকে।

ধনের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। কারণ, ধনকে হিফাযত করতে হয়, কিন্তু জ্ঞান মানুষকেই হিফাযত করে। খরচ করলে ধন নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান বর্ধিত হয়। ধন বিচারাধীন হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় বিচারক। ধন সঞ্চয়কারীরা জীবন থাকতেই মারা যায়, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়কারীরা মরণের পরও জীবিত থাকেন। যাঁদের দেহ তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি থেকে যায় সকলের মনে।

একজন শিক্ষিতের জীবন আলোময়, আর অশিক্ষিতের জীবন অন্ধকারময়।

মানুষের মাঝে যতই গুপ্ত থাক, জ্ঞানী মানুষের জ্ঞানই তাকে প্রকাশ ও উন্নত করে। যেহেতু জ্ঞান হল মোমবাতির শিখার মত; তাকে নীচের দিকে নিচু করলেও সে উপর দিকে উঠতে থাকে।

প্রত্যেক জিনিস বেশী হলেই তার দাম কমে যায়। কিন্তু জ্ঞান যত বেশী হয়, তার দাম তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে, ফুল বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মহৎ কর্মের জন্য মনীষীদের স্মৃতি মানুষের হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকে।

জ্ঞান হল আবরক পর্দা, সেই পর্দা দিয়ে তোমার দৈহিক ত্রুটি গোপন কর। আর ইল্ম হল ক্ষুরধার তরবারি, তা দিয়ে তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই কর। *(হযরত আলী)*

ইলমের (জ্ঞানের) মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে প্রকৃত আলেম নয়, সে তা দাবী করে এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞানী বললে সে খোশ হয়। আর মূর্খতার নিন্দা প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মূর্খ হয়েও কেউ নিজেকে মূর্খ মনে করতে চায় না এবং কাউকে মূর্খ বললে, সে রাগান্বিত হয়। *(হযরত আলী)*

আব্দুল্লাহ বিন ত্বাউস বলেন, আমাকে আমার আব্বা বললেন, বৎস! জ্ঞানীদের সাহচর্য অবলম্বন কর, তোমাকে তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হবে, যদিও তুমি তাদের মত জ্ঞানী নও। আর মূর্খদের সংসর্গ থেকে দূরে থাক, নচেৎ

তোমাকে তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হবে, যদিও তুমি তাদের মত মূর্খ নও। পরন্তু জেনে রেখো যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি শেষ সীমা আছে। আর মানুষের শেষ সীমা হল সুজ্ঞান লাভ। *(অফায়াতুল আ'য়্যান ২/৫১১)*

একজন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, উলামা শ্রেষ্ঠ, নাকি ধনীদল? বললেন, উলামাই শ্রেষ্ঠ। বলা হল, তাহলে উলামাকে ধনীদের দরজায় বেশী বেশী আসতে দেখা যায়, অথচ ধনীদেরকে উলামাদের দরজায় ততটা বা মোটেই দেখা যায় না কেন? বললেন, কারণ উলামারা ধনের কদর জানেন। আর ধনীরা জ্ঞানের কদর জানে না তাই।

চোর-ডাকাত ধন কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান কেড়ে নেওয়ার সাধ্য কারো নেই। *(হযরত আলী)*

ধনী লোকের সাধারণতঃ শত্রু বেশী, কিন্তু জ্ঞানী লোকের বন্ধু বেশী। *(হযরত আলী)*

জ্ঞানেই মানুষকে মর্যাদার আসন দান করে। বংশের গৌরব করা মূর্খতার লক্ষণ। *(ডাঃ লুৎফর রহঃ)*

এ জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও না, জ্ঞানদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। *(ডাঃ লুৎফর রহঃ)*

আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষিত জাতি দেব। মায়ের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ। *(নেপোলিয়ান)*

'বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,
নরের মাহাত্ম্য নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।'

জেনে রেখো যে, 'লিখাপড়া করে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।' আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারটিকে শুধু ভাগ্যের উপর সোপর্দ করে দিও না এবং বলো না যে, 'লেখাপড়া যেমন তেমন কপাল মাত্র গোড়া, চন্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া।' কারণ মানুষ তার চেষ্টার ফল অবশ্যই পায়।

(গ) কাজে বা পড়াশোনাতে মনোযোগ বাড়াতে তাতে পরকালের প্রতিদান আশা কর। দুনিয়ার জিন্দেগীর ক্ষণিক সুখের প্রতি যদি মন আগ্রহী না হয়, তাহলে পরকালে বিশ্বাসী মনকে পরকালের প্রতি আগ্রহী করে তুললে ঐ কাজে মনোযোগ বাড়বে। বেহেশ্তের বালাখানা, সেখানকার সুখ-সমৃদ্ধি, চিরকুমারী হুর ও গেলেমান ইত্যাদির লোভ রেখে কাজ করলে কাজে মনোযোগের অভাব হবে না।

(ঘ) কাজের পশ্চাতে পুরস্কার ও তিরস্কার উভয় দিক খেয়াল রেখে মনোযোগ সৃষ্টি করতে পার। পুরস্কারের লোভ এবং তিরস্কারের ভয় থাকলে তাতেই তুমি মনোযোগী হতে বাধ্য হবে।

(ঙ) শান্ত, নিরালা ও আরামদায়ক পরিবেশ নির্বাচন কর, তাহলেই মন চুরি না হয়ে মনোযোগ বজায় থাকবে। অন্যথা যেখানে অশান্তি, গোলমাল, হৈচৈ, চেঁচামেচি বা হিহিফিফি চলে অথবা বেশী গরম বা ঠান্ডা লাগে, সেখানে মনোযোগ বহাল থাকতে পারে না।

(চ) মনচোর শয়তান মানুষের চিরশত্রু। তার অসঅসা ও কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

(ছ) পিছুটানের কাজ থাকলে তা সেরে পড়াশোনায় বস। যেমন ঘুম বা প্রস্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে, পেটে প্রচন্ড ক্ষিদে থাকলে, পিপাসা থাকলে, চুলোতে হাঁড়ি থাকলে, কারো প্রতীক্ষা থাকলে সেসব দূর করে মনকে খালি করে মনোযোগ বৃদ্ধি কর।

(৪) শিক্ষক ও উস্তাদদেরকে গভীরভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা কর।

সকল ছাত্রকে অবশ্যই তার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে সম্মান করতে হবে, অন্তর থেকেই সম্মুখে ও পশ্চাতে তাঁদেরকে ভালোবাসতে হবে, শিক্ষকের কথা ভালোবাসার সাথে শ্রবণ করতে হবে, শিক্ষক বিরক্ত হবেন বা রেগে যাবেন এমন ভাব, ভঙ্গিমা বা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, খুব সাবধানে ও সতর্কতার সাথে উস্তাদদের সাথে কথা বলতে হবে, যে ধরনের আচার-আচরণ, চাল-চলন, হাব-ভাব দেখলে তাঁরা খুশী হতে পারেন ঠিক সেই ধরন ছাত্রকে গ্রহণ করতে

হবে। তাঁদেরকে খুশী করতে পারলে তাঁদের দুআ ও শিক্ষাদানে আন্তরিকতা পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে তাঁদেরকে নারাজ করলে বদ্দুআ পাওয়া যাবে এবং শিক্ষাদানে তাঁদের আন্তরিকতা লাভ করা সম্ভব হবে না। আর তাহলেই জীবন বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

কোন মাষ্টার মশায় কোন কারণে তোমাকে শাস্তি দিলে তাঁর প্রতি কুধারণা রেখো না। তাঁর প্রতি রাগ করো না। কারণ, তিনি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমার ভালাইর জন্যই তোমাকে আদব শিখাতে শাস্তি প্রয়োগ করেছেন। অতএব ধৈর্য ধরে সহ্য করে নিও। তিনি অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়ে থাকলে তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দিও। তাহলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে না। আর মনে রেখো যে, শিক্ষকের বেত্রাঘাত পিতার আদরের চেয়ে অনেক উত্তম।

জেনে রেখো যে, তোমার থেকে যারা উঁচু ক্লাশে পড়ে তারাও তোমার সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং তাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করো।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষক ও ওস্তাদকে সম্মান দিতে তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইসলামে বৈধ নয়। অবশ্য সীট ছেড়ে তাঁকে বসতে দেওয়া ভিন্ন কথা।

যেমন বৈধ নয়, তাঁর সাক্ষাতে পায়ের জুতা খুলে ফেলা অথবা তাঁর পা স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম করা।

অবশ্য ইসলামী নিয়মে তাঁর সাথে সালাম-মুসাফাহাহ কর এবং ভক্তির সাথে তাঁর কপালে চুম্বন দাও।

সতর্কতার বিষয় যে, তোমার শিক্ষক যদি কোনক্রমে দ্বীনদার না হয় অথবা বেদ্বীন হয় তাহলে তাকে সম্মান দাও, কিন্তু তার অনুসরণ করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}

অর্থাৎ, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

যদি তাঁর নিকট থেকে তোমার আকীদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা

পাও, তাহলে সে বিষয়ে উলামার নিকট ফায়সালা নিতে ভুল করো না। জেনে রেখো যে, যত বড়ই বিজ্ঞানী হন, তিনি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর শরীয়ত বিষয়ে ভুল করার বিষয়ে ত্রুটিমুক্ত নন।

আর খবরদার! উস্তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না। কারণ তা বেআদবের নিদর্শন। তাছাড়া তর্কপ্রিয় মানুষ আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে বেশী ঘৃণ্য।

(৫) সহপাঠীদের সাথে পাঠ্যালোচনা কর।

নিয়মিতভাবে সহশিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচর্চা করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। যে বিষয়টি একাকী বুঝতে কষ্ট হয় অথবা ভুল বুঝা থাকে, তা দু-পাঁচজনের যৌথ আলোচনায় অনেক সহজে সে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে এসে যায়। এখানে এক ছাত্র অপর ছাত্রের জন্য আয়নার মত কাজ করলে কারো পড়াশোনায় মোটেই কোন ত্রুটি অবশিষ্ট থাকে না। পরস্পর পাঠ্যালোচনা করলে পাঠ্য বিষয় অনেক দিন মনেও রাখা যায়। দর্সের নিয়মিত মুযাকারাহ দর্সকে পানির মত সহজ করে তোলে এবং তা হিফয রাখতে কষ্ট হয় না।

এমন সহপাঠী বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণ কর, যে তোমার সাফল্যের কাজে সহযোগী। যে তোমাকে পড়াশোনায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। যে তোমার প্রতি হিংসা না রেখে তোমার বড় হওয়াকে পছন্দ করে।

অবশ্য এমন সহপাঠী বা বন্ধু থেকে দূরে থেকো, যার কাছে বসলে সময় নষ্ট ছাড়া লাভ কিছু হয় না। পড়তে বসলে বাজে গল্প শুরু করে এমন ছাত্রের সাহচর্য থেকে দূরে থেকো। যে তোমার সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে দূরে থেকেই সালাম করো।

'দুর্জনেরে পরিহারি
দূরে থেকে সালাম করি।'

(৬) যা পড় বুঝে পড়।

বুঝতে না পারলে শিক্ষককে অথবা কোন সহপাঠীকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে লজ্জা বা অহংকার প্রদর্শন করো না। বুঝতে পারনি বলে অপরের কাছে

বুঝে নিলে তুমি ছোট হয়ে যাবে এই অনুভূতি যেন তোমাকে প্রশ্ন করতে বিরত না রাখে।

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কিভাবে আপনি এত ইল্মের অধিকারী হলেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'প্রশ্নকারী জিভ ও সমঝদার অন্তর দ্বারা।'

দুই প্রকার লোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়; লাজুক ও অহংকারী।

জেনে রেখো, না জেনে ও বুঝে যে নিজেকে বেশী জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মনে করে, সে সবচেয়ে বড় বোকা। আর যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে কিছু জানতে চায়, সে বোকা হয় কিছু সময়ের জন্য। আর জানার ভান করে অথবা জানে মনে করে যে কখনোও প্রশ্ন করে না, সে বোকা থাকে সারাটা জীবন।

(৭) শব্দের তত্ত্ব, তাৎপর্য, বিশ্লেষণ ও প্রকৃত অর্থ জানার চেষ্টা কর।

শব্দের মূল ধাতু বুঝতে পারলে সেই ধাতু থেকে উৎপত্তি বিভিন্ন শব্দের মানে বুঝতে অথবা শব্দ গঠন করতে তথা রচনা লিখতে বড় সুবিধা হয়। শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াপদ এবং তার বচন কি ইত্যাদি বুঝে বুঝে পড়লে যেমন বাক্যের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সহজ হয়, তেমনি সুবিধা হয় তার মান ও গুরুত্ব বুঝতে।

(৮) পাঠ মুখস্থ কর।

মুখস্থের বিষয় হলে, এখন বুঝে না এলেও মুখস্থ কর। পরে বুঝে এসে যাবে।

যদি বল, 'না বুঝে মুখস্থ করলে মুখস্থ করা বিষয়টি অতি সত্বর স্মৃতি থেকে মুছে যায়।' তাহলে বলব যে, সে কথা সত্য হলেও সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। ঐ দেখ না, অধিকাংশ হাফেয কুরআনের অর্থ বুঝে না, অথচ পানির মত তা মুখস্থ শুনাতে পারে।

পক্ষান্তরে মুখস্থের জিনিস প্রয়োজনে যথাসময়ে শুনাতে না পারলে অথবা সে সময়ে বই বা নোট দেখার দরকার পড়লে সে ইল্মের ততটা মূল্য নেই। কবি বলেন,

'গ্রন্থ বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,
নহে বিদ্যা, নহে ধন হলে প্রয়োজন।'

(৯) নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হও।

বিনা ওযরে কোন ক্লাশ খবরদার কামাই করবে না। পড়া নিজে নিজে বুঝার মত ক্ষমতা তোমার থাকলেও শিক্ষকের ব্যাখ্যাকে তুচ্ছ মনে করো না। যেহেতু তাঁর ব্যাখ্যায় হয়তো এমন কথা থাকবে যা তোমার কল্পনার বাইরে।

(১০) আউট বইও পড়।

কেবল সিলেবাসের পাঠ্যবইই নয়; বরং প্রয়োজনীয় আউট বইও পড়। নিয়মিত অর্থ বুঝে পাঠ কর গ্রন্থসম্রাট আল-কুরআন। কুরআনে আছে সর্বরোগের ঔষধ। কুরআনে আছে আদর্শ ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রেরণা। যে কুরআন শিখে ও শিখায় সেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

দ্রুত আরবী ইবারত পড়া অভ্যাস করতে বেশী বেশী অনুচ্চস্বরে কুরআন তেলাঅত কর। আরবী যাদের এ্যাডিশনাল সাব্জেক্ট তাদের উচিত, কুরআন পড়তে শিখে নেওয়া।

পড়া মনে থাকবে কিভাবে?

অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অভিযোগ করে থাকে যে, তারা পড়ে কিন্তু তাদের পড়া জিনিস মনে থাকে না। তাদের সুবিধার্থে এই প্রেস্কিপশন পেশ করা হল ঃ-

(১) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি চেয়ে নামাযে আল্লাহর কাছে দুআ কর।

(২) মনযোগ দিয়ে শোন। তাহলেই পড়া বুঝে আসবে।

(৩) যা পড়বে বুঝে পড়। যে কোন প্রকারে বুঝে পড়লে পড়া বিষয় মনে গেঁথে যায়। কেননা ভালোভাবে বুঝাই হল অর্ধেক মুখস্থ করা। পক্ষান্তরে না বুঝে মুখস্থ করলে মুখস্থ করা বিষয়টি অতি সত্বর স্মৃতি থেকে মুছে যায়।

(৪) নিয়মিত পুনরালোচনা ও পুনরাবৃত্তি কর। সহপাঠীর সাথে পাঠ্যালোচনা (মুযাকারাহ) কর।

(৫) মানসিক দুশ্চিন্তা দূর কর। প্রেম থাকলে মন থেকে মুছে ফেল। যৌনচিন্তাকে মনে স্থান দিও না। কোন রোগ থাকলে চিকিৎসা করাও। শোক থাকলে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রেখে তা মন থেকে দূর করে ফেল।

কোন টেনশন বা ভয় (ফেল হওয়ার ভয়, ফেল হলে অভিভাবকের বকুনি অথবা মারের ভয়) হলে তা মনে স্থান দিও না। ভয়কে জয় করে নির্ভয়ে পড়াশোনা কর। দারিদ্র, অভাব ইত্যাদির দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থাকলে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ ও অভাবমুক্ত হওয়ার দুআ কর।

জেনে রেখো যে, দুঃখ মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আনে। একজন দুঃখী মানুষ জ্ঞানী হতে পারে না। কারণ, দুশ্চিন্তা মানুষের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অপর দিকে জীবনে কষ্ট না পেলে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। জীবনে যাঁরা বিজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বেশী ছিল।

সুতরাং অভাব আছে, তার জন্য মাথায় হাত দিয়ে দুশ্চিন্তা কেন? পড়াশোনার মাধ্যমে বড় হও, বড় আশা রাখ, বড় চাকরি পাবে, কিছু একটা করার চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ তারই মাধ্যমে অভাব দূর হবে।

(৬) পাপ বর্জন কর। কারণ তাতে দুশ্চিন্তা থাকে; ফলে মেধা নষ্ট হয়। হৃদয়-মন স্বচ্ছ থাকে না; ফলে তাতে পড়াশোনা চিত্রিত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (١٤) سورة المطففين

অর্থাৎ, কক্ষনো না; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে। *(সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ১৪ আয়াত)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظى + فأرشدنى إلى ترك المعاصي

وأخبرنى بأن العلم نورٌ + ونور الله لا يُهدى لعاصي

অর্থাৎ, আমি আমার ওস্তাদ অকী'র নিকট আমার মুখস্থশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপাচরণ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন

এবং বললেন, 'জেনে রেখো, ইল্‌ম আল্লাহর তরফ হতে আসা (অনুগ্রহ বা) নূর। আর আল্লাহর (অনুগ্রহ বা) নূর কোন পাপিষ্ঠকে দেওয়া হয় না।' *(আল জাওয়াবুল কাফী ৫৪ পৃঃ)*

(৭) Survey Q 3R পদ্ধতি গ্রহণ কর।

Survey-তে জরিপ কর। তুমি এতদিন যে কয়টি বিষয় বা অধ্যায় পড়েছ তার মধ্যে জরিপ চালাও। কয়টি বিষয় তোমার মনে আছে, কি কি মনে নেই এবং কোন্‌টি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে ইত্যাদি। যে বিষয়টি ভুলে গেছ তা বারবার পড়, বুঝ এবং মুখস্থ করে ফেল। এভাবে নিয়মিত জরিপ চালিয়ে পড়লে স্মৃতিশক্তিকে অধ্যয়নকৃত বিষয়টি অনায়াসে গেঁথে যাবে এবং অনেকদিন পর্যন্ত তা মনে থাকবে।

আর Q 3R-এর অর্থ হল, Question, Read, Reciete and Review.

Question অর্থাৎ, পড়ার সময় নিজেকে নানা প্রশ্ন কর। এখানে এ শব্দ প্রয়োগ করা কেন হল? এ বাক্যটা এভাবে কেন হল? অন্যভাবে কি বলা যাবে? প্রভৃতি প্রশ্নের ভালো মত উত্তর খোঁজার চেষ্টা কর এবং বারবার তা চর্চা করতে থাক, তাহলে অবশ্যই ভাল ফল পাবে।

Read অর্থাৎ, পড়। যে বিষয়টি তুমি পড়বে বলে ঠিক করেছ, সেটি ভাল করে কয়েকবার পড় এবং তা বুঝার চেষ্টা কর। কোন একটি বিষয় বুঝে না এলে তাতে ধৈর্যহারা হবে না। বরং ধৈর্য সহকারে বারবার পড়তে থাক। তাহলেই দেখতে পাবে, অল্প কিছুক্ষণ পরেই সেটাকে আয়ত্ত করতে পেরেছ।

Reciete অর্থাৎ, আবৃত্তি কর। পড়ার বিষয়টি যদি আকার-ইঙ্গিতে বা ভাব-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে পারা যায় বা ভালভাবে আবৃত্তি করা যায়, তাহলে ঐ বিষয়টি অনেক দিন মনে থাকে।

Review অর্থাৎ, পুনরায় স্মরণ কর। অধ্যয়নকৃত বিষয়টিকে একবার পড়ে তালাক দিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। বরং বারবার তা স্মরণ করতে হবে।

যদি কোন অংশ ভুলে যাও, তাহলে আবার তা পড়ে নাও।

Survey Q 3R-এর নিয়ম মেনে চললে পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে এবং পড়া জিনিস অনেক দিন মনেও থাকবে। বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসের হাফেযদেরকে এ নিয়ম মেনে চলা একান্তভাবে জরুরী। সেই সঙ্গে 'মুরাজাআহ' বা Review-এর জন্য দৈনিক রুটিনে একটি সময় নির্দিষ্ট করা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, মুখস্থ করার সময় বারবার আবৃত্তির সাথে হিলাদোলা উচিত নয়। কারণ এটি ইয়াহুদীদের কিতাব পড়ার অভ্যাস।

(৮) মনে রাখার ৪টি উপায় আছে ঃ-

১। যা মনে রাখতে চাও, শুধু তার প্রতিই মনোযোগ দাও। সবকিছু মনে রাখার চেষ্টা করবে না। শুধু যা কাজে লাগবে তা মনে রাখার জন্য নির্বাচিত কর।

২। যা মনে রাখতে চাও, তাকে এক পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় রূপান্তরিত কর। আংশিক না করে বিষয়টি পুরোপুরি শিখতে বা বুঝতে চেষ্টা কর। অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি নজর দাও।

৩। হুক, আংটা বা কিউ ব্যবহার কর। কান ও মাথার সংযোগ ঘটাও। চিত্রকল্প তৈরী ও যোগসূত্র স্থাপন কর। ধারণাকে গল্প বা ছন্দের রূপ দাও। তাহলে তথ্যটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। ভালোভাবে মনে রাখার জন্য নিজস্ব টেকনিক প্রয়োগ কর। যেমন কয়েকটি বিষয় বা বস্তুকে মনে রাখতে প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর প্রথম অক্ষর নিয়ে একটি শব্দ গঠন করে তা ব্রেনে গেঁথে নাও। যেমন; রঙধনুর সাতটি রঙের নাম মনে রাখতে 'বেনীআসহকলা', ক্বিরাআতে হরূফে ইদগাম মনে রাখতে يرملـــون কোন আসমানে পর্যায়ক্রমে কোন নবী আছেন সে কথা মনে রাখতে أعياهما ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৪। মাঝে মাঝে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নাও। মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস কর অতীতের কি কি বিষয় তুমি মনে রাখতে চাও, কি কি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন? জিজ্ঞেস কর নিজেকে, গতকাল ও আজ কি কি শিখেছ, যা আগামী কাল তুমি মনে করতে চাও। *(সাফল্যের চাবিকাঠি ১৩৬-১৩৭পৃঃ)*

স্টুডেন্ট্ শব্দের তাৎপর্য ও ছাত্র-ছাত্রীর গুণাবলী

ছাত্র-ছাত্রীর ইংরেজী শব্দ Student-এর আক্ষরিক তাৎপর্য করলে অনেকের মতে তাতেও একজন আদর্শ ছাত্রের গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন ঃ-

S= Study ঃ অর্থ অধ্যয়ন। অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকে অবশ্য অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। ছাত্রসমাজের একমাত্র পেশা ও নেশা হওয়া চাই অধ্যয়ন। অধ্যয়নই একজন আদর্শ ছাত্রের সাধনা। প্রত্যেক পেশার মানুষদের যেমন নির্দিষ্ট এক এক শ্রেণীর নেশা থাকে, ঠিক তেমনি ছাত্রের নেশা হবে বই পড়া। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভালো মত না বুঝতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বারবার ধৈর্যসহকারে বুঝার চেষ্টা করবে। কোন বিষয়কে ভালোভাবে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে ধৈর্যসহকারে বারবার প্রচেষ্টার নামই অধ্যবসায়। ছাত্রদেরকে অধ্যবসায়ী হতে হবে।

T= Tendency ঃ অর্থ ঝোঁক বা প্রবণতা। অর্থাৎ, পড়াশোনার দিকে ঝোঁক ও প্রবণতা থাকতে হবে ছাত্রছাত্রীর। যেখানে ও যে কাজেই থাকুক না কেন, তাকে দেখে বুঝা যাবে যে, পড়ার প্রতি তার ঝোঁক ও নেশা আছে। যেমন প্রত্যেক সময় তার কাছে কাগজ ও কলম থাকবে। প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কথা নোট করবে। যেহেতু আরবীতে প্রবাদ আছে, العلم صيد، والكتابة قيـــد অর্থাৎ, ইল্ম হল শিকার স্বরূপ, আর তার ফাঁদ হল লিখন।

তদনুরূপ সব সময় তার সাথে কোন না কোন মূল্যবান বই থাকবে। সময় হাতে পেলেই তা খুলে পড়তে শুরু করবে। সফরে বাসে-ট্রেনে-প্লেনের সীটে বসে থাকা অবস্থায় সে বই পড়ে সময়কে কাজে লাগাবে। আর এটাই হল পড়াশোনায় যত্নশীলতা। আর 'যতনে রতন মিলে কিছু নহে যত্ন বিনা।'

U= Unity ঃ অর্থ একতা। অর্থাৎ, সকল ছাত্রের মাঝে একতা থাকা আবশ্যক। যেহেতু একতাই বল। ছাত্রসমাজের মধ্যে যদি একতার এই গুণটি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তারা একে-অপরের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হবে, একে-অন্যের সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারবে। তাদের মধ্যে একজন কোন পড়া বুঝতে না পারলে সকলেই তাকে ঐ না বুঝা বিষয়টি বুঝিয়ে দিবে। সকলেই ভালো ছাত্র হবে বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলে এ ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করলে তথা তাদের মধ্যে Unity বিদ্যমান থাকলে তারা সবাই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছতে সক্ষম হবে। আর তাদেরকে ঐ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনোর রাস্তা থেকে কোন অপশক্তি দূরে সরিয়ে আনার দুঃসাহসও করবে না।

অবশ্য এখানে Unity মানে রাজনৈতিক শক্তির হাতিয়ারে পরিণত হওয়া নয়; বরং ছাত্রদের আসল দায়িত্ব-কর্তব্য তথা অধ্যয়ন করার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে সকলের মধ্যেকার একতাকেই Unity বলা যায়।

D= Disciplin ঃ অর্থ নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ। অর্থাৎ, ছাত্রদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিকল্পিত সময়ানুযায়ী চলার জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন তৈরী করে নিতে হবে। তাদেরকে পড়ার সময় পড়া, লেখার সময় লেখা, খেলার সময় খেলা এবং ভ্রমণের সময় ভ্রমণ করতে হবে। প্রতিদিন ভোরে উঠে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায পড়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেই শুরু করবে দিবসের প্রারম্ভিক কাজকর্ম তথা নিজেদের ক্লাসের পড়াশোনা।

মাগরেবের পর হতে রাত ১১টা পর্যন্ত নিয়মিত অধ্যয়নের চেষ্টা করবে। বেশী রাত্রি না জেগে খুব ভোর-ভোর ওঠার অভ্যাস থাকলে মনের মধ্যে স্ফূর্তি আসে। তাছাড়া মুক্ত সজীব ভোরের বাতাস সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় নিয়ামত।

আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গাঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক

গাঁটের সময় এই মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে দেয়, 'তোমার এখনো লম্বা রাত বাকী। সুতরাং এখনও ঘুমাও।' অতঃপর সে যদি জেগে আল্লাহর যিক্র করে, তবে একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর ওযু করলে আর একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর নামায পড়লে সকল বাঁধনগুলোই খুলে যায়। ফলে ফজরের সময় সে উদ্যম ও স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে ওঠে। নতুবা আলস্যভরা ভারী মন নিয়ে সে ফজরে ওঠে।" *(মালেক, বুখারী ১১৪২নং, মুসলিম ৭৭৬নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

ইংরেজীতে একটি কথা আছে,

Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise.

অর্থাৎ, সকাল সকাল ঘুমানো এবং সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস মানুষকে সুস্বাস্থ্যবান, সম্পদশালী ও বিজ্ঞ করে তোলে।

তাছাড়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে ৩টি ব্যায়াম উত্তম ঃ ভোরের মুক্ত বাতাসে হাঁটা, সাঁতার কাটা এবং ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ানো।

পক্ষান্তরে অনেকেই রাত্রিতে বেশী জেগে সকালে ঘুমানোর চেষ্টা করে- এটা ঠিক নয়। কেননা সকালে ঘুমালে সারাদিনটাই তাকে মন্দা-মন্দা ভাবে অপূর্ণতার ও অলসতার সাথে কাটাতে হয়। তাই ছাত্রদের উচিত হবে, ফজরের পূর্বে বা ফজরের আযানের সাথে সাথে জাগ্রত হওয়া এবং নামায পড়ে আর না ঘুমিয়ে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করা। কারণ, সকালে সারাদিনের প্রারম্ভিক কাজ ভালো মত উদ্বোধন করতে পারলে সারাদিনই তার ভালোভাবে কেটে যাবে এবং দেহ-মন ভালো থাকবে; অলসতা দূরীভূত হবে। ইংরেজীতে বলে,

Well starting is the half of the finishing work.

অর্থাৎ, ভালোভাবে কাজের সূত্রপাত তার পরিসমাপ্তির অর্ধাংশ।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্রকে সকালেই ভেবে নিতে হবে, আজ সারাদিনে তাকে কি করতে হবে। তেমনি রাত্রে শোবার সময়ও ভেবে দেখে নিতে হবে সারাদিন সে তার সমস্ত কর্তব্য যথার্থরূপে পালন করেছে কি না। আগামী কালের পড়া

মুখস্থ হয়েছে কি না। আগামী কাল ওস্তাদের সামনে যে ইবারত (রিডিং) পড়তে হবে তা পড়ে দেখেছে কি না।

নিজের জীবনকে যেমন নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ করতে হবে, তেমনি বাড়ি তথা গার্জিয়ানের নিয়ম-রীতি এবং ওস্তাদ তথা মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের নিয়ম-নীতি মেনে নিজেকে একজন নিয়মনিষ্ঠরূপে পরিচয় দিতে হবে।

অন্যথা অনিয়মিতভাবে চললে কোন কাজই সঠিকরূপে সম্পাদিত হবে না, ফললাভ হবে না যথেষ্ট। সর্বোপরি তখন জীবনে দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা, অনিয়মতান্ত্রিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

আজকের পড়া আজকেই তৈরী না করলে দিন দিন বকেয়া পড়ার একটা স্তূপ তৈরী হলে পরীক্ষার মুহূর্তে ছাত্রকে মনমরা হতে হয়, পরীক্ষার সময় ভয়-ভয় লাগে, পরীক্ষাটা একটি বাড়তি ঝামেলা বলে মনে হয় এবং অনেক সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও বড় কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য, আজকের পড়া আজকেই সেরে নিয়ে তার সারাংশটা বা সারমর্মটা মনের মণিকোঠায় যত্নের সাথে তুলে রেখে সামনের পড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ছাত্রের ভবিষ্যৎ-জীবন বড় উজ্জ্বলরূপে দেখা দেয়।

E= Energy ঃ অর্থ শক্তি। অর্থাৎ, ছাত্র-ছাত্রীকে এনার্জী, শক্তি, বল ও সাহসের অধিকারী হতে হবে। যেহেতু দুর্বল, হতবল ও হীনবল ব্যক্তি পদে পদে অবহেলার শিকার হয়। ছাত্রদের মনের মধ্যে যেন কোন প্রকার দুর্বলতা, হীনম্মন্যতা স্থান না পায়। কোন ছাত্র বা ছাত্রী যেন নিচুমনের অধিকারী না হয়। তারা হবে সর্বদা সাহসী, বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর, দৃঢ়চেতা, সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় এবং অন্যায়ের প্রতি বজ্রকঠোর। 'শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমন' নীতি পালন করার জন্য তারা হবে অবিচলিত মনোবলের অধিকারী। তাদের সিদ্ধান্ত হবে একটাই। আর তা হল, গভীরভাবে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অধ্যয়নকৃত বিষয়টি নিজে ভালোমত বুঝা এবং অন্যকে বুঝানোর ক্ষমতা অর্জন করা। প্রথমবারে বুঝতে না পারলে ঐ বিষয়টিকে ধৈর্যহারা হয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না; বরং কঠিন বিষয়টিকে বারবার পড়তে হবে, তা বুঝার জন্য অন্য ছাত্র অথবা

শিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে এবং ভালোভাবে না বুঝা পর্যন্ত ঐ বিষয়টিকে পরিত্যাগ করে অন্য বিষয়কে ধরা ঠিক হবে না। কারণ তাতে পরবর্তী বিষয় বুঝতে অধিক কষ্ট পেতে হবে।

শক্তি-সাহস ও উদ্যম-উৎসাহ নিয়েই সামনের পড়ার প্রতি অগ্রসর হতে হবে। মনোবল হারিয়ে পড়াতে নিরুৎসাহ হলে মোটেই চলবে না। উৎসাহ হারিয়ে গেলে কি কাজে মন থাকে? 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

জেনে রেখো যে, 'আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই আমাদের অজ্ঞানতার বল।' আর ছাত্রজীবন হল মনোবল তৈরী করার জীবন। ছাত্র-ছাত্রীর উপরেই নির্ভর করে জাতির বল।

"আমরা শক্তি, আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।"

N= Neat and Clean ঃ অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ, ছাত্র-ছাত্রীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

আমাদের দ্বীন এ ব্যাপারে বড় গুরুত্ব আরোপ করে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤) سورة المدثر

অর্থাৎ, আপনি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। *(সূরা মুদ্দাস্সির ৪ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, পবিত্রতা হল অর্ধেক ঈমান। পূর্ণরূপ ওযূ করা অর্ধেক ঈমান। আর দাঁতন করা হল অর্ধেক ওযূ। *(সহীহুল জামে')*

পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষকে করে সজীব, সতেজ, তরতাজা এবং হৃদয়-মনে এনে দেয় আনন্দ ও উৎফুল্লতা। তাই পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুন্দর জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যেহেতু ছাত্রজীবন, তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ করে জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে Neat and Clean হওয়া আবশ্যক।

নিয়মিতভাবে নিজের পড়ার কক্ষ, খাবার কক্ষ, থাকার জায়গা, নিজের কাপড়-চোপড়, দেহ-মুখ-মন এবং বাড়ির আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আমাদের নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙ্গিনা হল ইয়াহুদীদের আঙ্গিনা।" *(সহীহুল জামে' ৩৯৪১নং)* অর্থাৎ, বাড়ির সম্মুখভাগকে অপরিষ্কার করে রাখা কোন মুসলিমের কাজ নয়। সে কাজ হল ইয়াহুদীর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ছুটির দিনটিকে বেছে নিতে হবে। নিজের পড়ার টেবিলটিকে রাখতে হবে সুসজ্জিত, বইগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রও ঠিক-ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হবে; যাতে প্রয়োজনের সময় তা খুঁজতে সময় ব্যয় না হয়।

টেবিলের সামনে রাখতে হবে দৈনন্দিন কাজকর্মের তালিকা বা রুটিন। প্রতিদিন গোসল করার অভ্যাস বানাতে হবে। তাতে দেহ-মন চাঙ্গা থাকবে।

সময় মত নখ, চুল,দাঁত ও ত্বকের যত্ন নিতে হবে।

এ হল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার কথা। অবশ্য মনের পরিচ্ছন্নতার কথা ভুলে যেও না। মানুষের প্রতি মন পরিষ্কার রাখ। মন পরিষ্কার থাকলে সর্বদেহ পরিষ্কার রাখা সহজ হবে।

মনকে পরিষ্কার ও মুক্ত রাখ সর্বপ্রকার শির্কী ধারণা ও বিশ্বাস থেকে, বাজে চিন্তা-ভাবনা থেকে, কুচিন্তা, কুটিলতা ও কপটতা থেকে।

মনকে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে প্রেমের আবেগ থেকে। কারণ ছাত্রজীবন বড় মূল্যবান সময়। এ সময়টিকে প্রেমের আত্মঘাতী ফাঁদে পা দিয়ে অযথা নষ্ট করা উচিত নয়।

প্রেমে পড়াশোনার মনোযোগ নষ্ট হয়। বৈধ অথবা অবৈধ অতিরিক্ত প্রেম ছাত্র-ছাত্রীর মনকে উতলা করে তোলে। আর তার ফলেই অনেকে পরীক্ষায় ফেল করে অথবা পড়াশোনা ছেড়ে প্রেম অনির্বাণ করে।

অথচ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জেনে রাখা দরকার যে, ছাত্রজীবনের প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিকে না। বরং এই প্রেমই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভিশাপে পরিণত হয়।

প্রেম হল এক প্রকার এমন আগুন, যাতে একবার পা দিলে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায় জীবনের মূল্যবান সময়। প্রেম হচ্ছে জ্বালা-যন্ত্রণা। অন্তরের মধ্যে

সর্বদা প্রেমিকার কল্পনাই জীবনকে জ্বালিয়ে দেয়, যন্ত্রণা দেয়। তার মধ্যে একটু হাসি-আনন্দ থাকলেও দুঃখ-যন্ত্রণাই আনন্দের তুলনায় অনেক বেশী।

জেনে রেখো যে, ছাত্রজীবনে প্রেম বর্জন করার মাঝে আছে মহা সফলতা। প্রতিভাবানের প্রতিভার প্রতিভাত ঘটে, যদি সে প্রেমের ফাঁদকে এড়িয়ে চলতে পারে। নচেৎ স্মৃতিমানের স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে ভুলাক্কার বানায়, মেধাবীর মেধা নষ্ট করে গাধা বানায় এবং বুদ্ধিমানের বুদ্ধি নষ্ট করে নির্বোধ বানায় ঐ প্রেম। প্রেম আনে ছাত্রজীবনে অসফলতা, প্রেম বয়ে আনে কর্মজীবনে বেকারত্বের চির অভিশাপ এবং ইহ-পরকালে আনে মহা লাঞ্ছনা।

'প্রেম করে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা,
প্রাণসম ভাবি পরে পর আপন হল না।
না বুঝে মজিলাম পরে না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হবে লাঞ্ছনা।'

অবশ্য যদি বল যে, প্রেম করতে হয় না, তা তো এমনিই হয়ে যায়। তাহলে বলব যে, তা হলেও তাকে হৃদয়ের মাঝে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যত্নের সাথে লালন করা তোমার দায়িত্বে। অতএব সে কাজ বর্জন না করে নিজের উপায়হীনতার কথা উল্লেখ করা উচিত নয়।

ভালোকে সবাই ভালোবাসে। তুমি ভালো হলে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, তা বলে তার সময় ও সীমা রক্ষা না করে উচ্ছৃঙ্খল হলে তো বিফলতা তোমার সাথে আলিঙ্গন করবে।

তাছাড়া বিবাহ ছাড়া ছেলে-মেয়ের প্রেম তো হারাম। যার সাথে প্রেম করলে গোনাহ হয়, যাকে তাকিয়ে দেখলে পাপ হয়, যার সাথে প্রেমালাপ করলে অন্যায় হয়, তার যিক্র মনে-প্রাণে রেখে পবিত্র, সুন্দর ও উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখা কি বৃথা নয়? হয়তো বা একদিন কবির মত বলতে বাধ্য হবে,

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

জেনে রেখো যে, এ জীবনে -বিশেষ করে এই স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে- 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতির বড় গুরুত্ব রয়েছে। যে মনে আল্লাহর ভয় আছে, সে মনে অপবিত্র প্রেম বাসা বাঁধতে পারে না। যে ছাত্র পাপমুক্ত, তার মন সুস্থ ও সবল। সে মনের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশী। অল্প সময় পড়ে অনেক বেশী সময় মনে থাকে ঐ ছাত্রের পড়া।

এ কথা সত্য যে, তুমি যদি সুচরিত্রবান মেধাবী ছাত্র অথবা ছাত্রী হও, তাহলে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করে তোমার মন যেন কোন অবৈধ ভালোবাসাকে প্রশ্রয় না দেয় -সে খেয়াল অবশ্যই রাখবে। আর সর্বদা কবির এই কথা স্মরণে রাখবে,

'গোলাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোতা যাসনে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে।'

T= Truthfulness ঃ অর্থ সত্যবাদিতা। অর্থাৎ, ছাত্রকে সদা সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। ছাত্রদেরকে সত্য কথা বলতে হবে, সত্যের সমর্থন করতে হবে এবং সৎ সাহস নিয়ে চলতে হবে।

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। সত্যের ক্ষয় নেই। সত্যবাদী ব্যক্তি মাত্রই দুআর পাত্র। সত্যবাদী ছাত্র সর্বদা সত্য কথা বলার দরুন মানুষের দুআয় সে অনেক বড় হতে পারবে। জীবনে সুখী হতে পারবে, অপরকে সুখী করতে পারবে এবং পরকালেও সে সুখী হবে।

পিতামাতা, ভাইবোন, শিক্ষকরা, ছাত্ররা এবং সাধারণ লোকেরাও তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসবে। দেশবাসী কামনা করবে এমন ছাত্রের নেতৃত্ব। জনপ্রিয়তা বাড়লে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী চাইবে এমন লোককে চাকরী দিতে। যেহেতু যে সত্যবাদী হবে, সে আমানতে খিয়ানত করবে না। দুর্নীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। সত্য ও সততার সাথে থাকবে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

এমন সত্যাশ্রয়ী ছাত্র কোনদিন তার কাজে-কর্তব্যে ফাঁকি দেবে না। তার কাছে থাকবে না কোন মিথ্যাচারিতার আশ্রয়। থাকবে না তার কাছে কোন প্রকার ধোকাবাজি ও প্রতারণা। প্রতারিত করবে না শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ তথা নিজেকে। সত্যের আদর্শ তাকে এক মহান মানুষ রূপে গড়ে তুলবে।

এমন ছাত্র সহসায় 'হক' চিনতে পারবে এবং 'হক' গ্রহণ করবে। যেহেতু 'হক' ও সত্যের সূর্য এতই উজ্জ্বল যে, তার আলোয় আলোকিত হতে এমন ছাত্রের কোন অসুবিধা থাকে না।

ছাত্রদের উচিত, দ্বীন, দেশ ও জাতির সেবার নিয়তে এবং নিজেদের জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য পুস্তিকার সকল গুণাবলীর পূর্ণ অনুশীলন করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই একজন কম মেধাবী ছাত্রও ভাল ও আদর্শবান ছাত্র হিসাবে সামাজিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে নিঃসন্দেহে।

ছাত্র যদি তার ছাত্রত্বের গুণাবলী হারিয়ে বসে, তাহলে পরবর্তীতে বেকার জীবনের অভিশাপ নিয়েই কর্মজীবনের উদ্বোধন করতে হয়। 'আজকের শিশু, কালকের পিতা অথবা মাতা' প্রত্যেক শিশুই ভবিষ্যতের নাগরিক। আজকের ছাত্র, কালকের শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা। জাতির ভবিষ্যত তারাই। সুতরাং সেই গুণাবলীর সাথে সেই উদ্যোগ ও আগ্রহ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীকে তৈরী করতে হবে নিজেদের জীবন। নচেৎ শিক্ষাহীন জীবনের এবং মূর্খ জাতির মূল্যায়ন কে করবে?

সকালে উঠে একজন শিশু ছাত্রের মত সঙ্কল্প করে তুমিও বল,

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাই-বোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
মোর লাগি ব্যথা নাহি পায় দাস-দাসী।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়া থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া তাহা বলি মনে মনে।'

ছাত্র-ছাত্রীর আদব-চরিত্র

সাধারণভাবে চরিত্রবান মুসলিম নারী-পুরুষের গুণাবলী এই যে, তারা লজ্জাশীল হয়, অপরকে কোন প্রকার ব্যথা দেয় না, শান্তি ও শৃঙ্খলতা পছন্দ করে, সকলের জন্য মঙ্গলকামী হয়, সত্যবাদী, মিতভাষী, মিষ্টভাষী, ধৈর্যশীল, সহ্যশীল, কৃতজ্ঞ, অল্পেতুষ্ট, অঙ্গীকার পালনকারী, আমানতদার, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, ভদ্র, সুশীল, শিষ্টাচার, বিনয়ী, হাসিমুখো, মেহনতী হয়। তাদের পদস্খলন কম ঘটে, বাজে কথা ও কাজে থাকে না, লোকের সাত-পাঁচে থাকে না, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে, সম্ভ্রম বজায় রাখে, কাউকে লানতান, অভিশাপ ও গালিমন্দ করে না, কারো চুগলি (লাগান-ভাজান), গীবত (পরচর্চা-পরনিন্দা) করে না, হিংসুক, কৃপণ, পরশ্রীকাতর ও লোভী হয় না, যারা আল্লাহর জন্য সব কিছু পছন্দ করে ও ভালোবাসে এবং তাঁরই জন্য ঘৃণা করে ও মন্দবাসে। তাঁরই জন্য আনন্দিত ও রাগান্বিত হয়।

আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে তুমি কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে হাসি মুখে করো, কথা বললে মিষ্টি ভাষায় বলো, কেউ কথা বললে ধ্যান দিয়ে শুনো, অঙ্গীকার করলে যথারূপে পালন করো, মূর্খদের সাথে মজা-ঠাট্টা করো না, হক ও সত্য যে গ্রহণ করে না তার মজলিসে বসো না, বেআদবের সাথে ওঠাবসা করো না, যে কথা ও কাজে অপমানিত হতে হয় সে কথা ও কাজে থেকো না।

জেনে রেখো, তোমার মরণের পরে তোমার চর্চা অবশিষ্ট থেকে যাবে, অতএব তুমি তোমার চর্চাকে ভালো করে গড়ে তোল। আর মরণের পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, তা হচ্ছে তার ব্যবহার।

অপরকে মুগ্ধ করার জন্য তুমি তোমার মিষ্টি মুখ ব্যবহার কর। যার মুখ মিষ্টি, তার বন্ধু অনেক।

সচ্চরিত্রের গুণবানের মন হবে সরল, হৃদয় হবে উদার, চেহারা হবে হাস্যময় এবং ভাষা হবে মধুর।

কল্পনা করো যে, তুমি যেন প্রত্যেক মানুষের ক্যামেরার সামনে আছ, সুতরাং তোমার মুচকি হাসি প্রদর্শন কর, সকলের কাছে তোমার ছবি সুন্দর লাগবে।

মুচকি হাসি বিদ্যুত অপেক্ষা খরচে কম, কিন্তু চমকে অনেক বেশী।

তরবারি দ্বারা জয় অপেক্ষা হাসি দ্বারা জয়ের মান ও স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

সুন্দর চরিত্র জীবনের অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি। আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮নং)*

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী ৬৩৫ নং, মুসলিম ২৩২১নং)*

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৭৯নং)*

তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(সহীহুল জামে ১৭৪৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষকে সুন্দর চরিত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ (সম্পদ) অন্য কিছু দান করা হয় নি।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৯৭৭নং)*

অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।"

আর অধিকাংশ কোন অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।" *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/৩২৪)*

ছাত্র তো দূরের কথা কোন মুসলিম মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্রবান হতে পারে না। যেহেতু মিথ্যাবাদীর কোন সম্ভ্রম নেই, প্রতারকের বন্ধু নেই এবং দুশ্চরিত্রের নেতৃত্ব নেই।

কিছু অজানা থাকলে জিজ্ঞাসা কর, পাপ করলে লজ্জিত হও, লজ্জিত হলে পাপ বর্জন কর, কারো প্রতি অনুগ্রহ করলে তা গোপন কর এবং কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে ধৈর্য ধর।

ছাত্র জীবনে নিরাপত্তা একটি বড় নেয়ামত; এই নেয়ামত অর্জন কর।

নিরাপত্তার দশটি অংশ। এর মধ্যে নয়টি আছে (আল্লাহর যিক্র ছাড়া) নীরবতায়। আর বাকী একটি আছে বেওকুফদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকায়। দারিদ্রের সৌন্দর্য ধৈর্য। ধনবত্তার সৌন্দর্য কৃতজ্ঞতা। ইসলামের চেয়ে অধিক গৌরব কোন বংশে নেই। তাকওয়ার চেয়ে অধিক সুন্দর শিষ্টাচারিতা অন্য কিছু নেই। তওবার চেয়ে অধিক সফল সুপারিশকারী অন্য কেউ নেই। নিরাপত্তার চেয়ে সুন্দর পরিচ্ছদ অন্য কিছু নেই।

তিনটি কাজে রয়েছে পরিপূর্ণ মঙ্গল; নীরবতা, কথন ও দর্শন। কিন্তু যে নীরবতা সুচিন্তার জন্য নয়, তা ভ্রান্ত। যে কথায় কোন হিকমত নেই, তা অসার এবং যে দর্শনে কোন উপদেশ নেই, তা বৃথা।

মনে রেখো যে, মানুষের ভদ্রতাই তার ব্যবহারকে সুন্দর করে তোলে।

গাযালী বলেছেন, মর্যাদা লাভ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে, রক্ত-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। সৌন্দর্যের সুষমা বিকশিত হয় শিষ্টাচারের মাধ্যমে, উত্তম পোশাকে নয়।

কোন ভদ্র মানুষকে ক্রয় করার মূল্য তোমার নেই। কিন্তু তুমি তাকে ভক্তি দাও, সে তোমাকে তার হৃদয় বিক্রয় করে দেবে। আর এর ফলে তুমি তার মালিক হয়ে যাবে।

মুহাল্লাব বলেন, অবাক লাগে যে, লোকে মাল দিয়ে দাস ক্রয় করে, অথচ সুব্যবহার দিয়ে স্বাধীন মানুষ ক্রয় করে না।

হযরত আলী ﷺ বলেন, যে লোক ভদ্র, তার কথাও নম্র। ভদ্রতা উন্নত চরিত্রের লক্ষণ, আর নম্রতা উৎকৃষ্ট ইবাদতের লক্ষণ।

ভদ্রতা হল অসার ও ফালতু বিষয় ত্যাগ করা, বিচক্ষণতা হল সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, ধৈর্য হল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা, কঠিন হল ক্রোধ সংবরণ করা এবং অবৈধ অতিরঞ্জন হল কারো প্রতি অতি

প্রেম অথবা অতি ঘৃণা করার নাম।

আবূ বাকর আল-অর্রাক তাঁর দেওয়া উপদেশে বলেন, তুমি যা কিছু জান, তার সবটাই বলো না। যা কিছু জান না, তার সব বিষয়েই প্রশ্ন করো না। যা কিছু শুনেছ, তার সবটাই প্রচার করো না। তোমার ভেদ প্রকাশ করো না। অন্যের ভেদ খুঁজতে চেষ্টা করো না। বন্ধুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো না। শত্রু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করো না। নিজের ত্রুটি গণনা কর। প্রভুর মুনাজাতে রত হও এবং কৃত পাপের জন্য রোদন কর।

সেই ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্বল, যে নিজের ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিমান, যে নিজের রাগ দমন করতে সক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ধৈর্যশীল, যে নিজের অভাবের সময় ধৈর্য ধরে। আর সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ধনী, যে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

যে তোমার থেকে সর্বদিক দিয়ে নিচু তার উপর ধৈর্য ধরা প্রকৃত ধৈর্য ও সহনশীলতা, যেখানে সত্য বললে তোমার ক্ষতি হবে, সেখানে সত্য বলাই প্রকৃত সত্যবাদিতা। যার কাছে কিছু আশা কর না এবং যাকে মোটেই ভয় কর না, তার সাথে সততা বজায় রাখা হল প্রকৃত সততা।

জ্ঞান ও আদব শিক্ষা কর। লেখে শিখ, দেখে শিখ। ঠেকে শিখ ও ঠকে শিখ।

জ্ঞান অর্জন কর, যদিও তোমার শত্রুর নিকট থেকে হয়।

হিকমত ও প্রজ্ঞা গ্রহণ কর, চাহে যে পাত্র থেকেই হোক।

মনের লোভ সংবরণ কর। যেহেতু ইল্‌ম যত বাড়ে, বাসনা ততই ছাড়ে। বল, 'চাই নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ। যে তাজ বিষয় আনে মুহূর্তে বিনাশ।'

জ্ঞান শিক্ষা করতে অথবা করে তুমি অহংকারী হয়ো না। তুমি যত বড়ই জ্ঞানী হও, যত বড়ই ডিগ্রি অর্জন কর এবং যত বড়ই চাকরি পাও, তাতে যেন তোমার মনে অহংকার স্থান না পায়।

হযরত আলী ﷺ পুত্র হাসান ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, বৎস্য! আমার ৪টি কথা মনে রেখো ঃ সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল বুদ্ধিমত্তা, সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় বাতুলতা হল অহংকার এবং সবচেয়ে উচ্চ

বংশ হল সচ্চরিত্রতা।

অহংকার থেকে দূরে থাক, কারণ অহংকার হক গ্রহণে বাধা দেয়। হিংসা থেকে দূরে থাক, কারণ হিংসা উপদেশ দান ও গ্রহণ করতে বাধা দেয়। ক্রোধ থেকে দূরে থাক, কারণ ক্রোধ ন্যায়পরায়ণতায় বাধা দেয়। আর কামনা থেকে দূরে থাক, কারণ কামনা ইবাদতে বাধা দেয়।

যে ৩টি জিনিস বর্জন করবে, সে ৩টি জিনিস অর্জন করবে; যে অপব্যয় বর্জন করবে, সে ইজ্জত অর্জন করবে। যে কৃপণতা বর্জন করবে, সে মর্যাদা অর্জন করবে। আর যে অহংকার বর্জন করবে, সে সম্মান অর্জন করবে।

অনেক বড় মানুষ আছেন, যাঁর সামনে গেলে নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত বড় মানুষ হলেন তিনিই, যাঁর সামনে গেলে কেউ নিজেকে ছোট ভাবে না।

দুর্বলদের সাথে ব্যবহারেই মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। মহান ব্যক্তিরা কোনদিন অপরকে ছোট ভাবেন না। কারণ, তাঁরা জানেন যে, মনের ভিতর সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকলে বেহেশ্ত্ লাভের আশা করা যাবে না।

আসলে জ্ঞান যত বাড়ে, জ্ঞানীর বিনয় তত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু বিদ্যা যতই বাড়ে, ততই জানা যায় যে, আমি কিছুই জানি না।

সুতরাং অপরের বড়ত্ব স্বীকার কর। ভেবে দেখ, তিনি অনেক বিষয়ে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী।

আর সত্য কথা এই যে, প্রকৃত আলেমগণ তাঁদের চাইতে নিম্নমানের আলেমদেরকে তুচ্ছ মনে করেন না, তাঁদের চাইতে বড়দের বড়ত্ব স্বীকার করেন ও তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করেন।

'তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।' (রবী)

মহান আল্লাহ বলেন,

{نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (٧٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপরে আছে অধিকতর জ্ঞানী। *(সূরা ইউসুফ ৭৬ আয়াত)*

শিক্ষার ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হিংসা থেকে সুদূরে থাক। বৈধ হিংসায় তুমি বিজ্ঞ লোকের সমান হওয়ার কামনা রাখতে পার। কিন্তু তাঁর জ্ঞান নষ্ট হওয়ার কামনা অথবা তাঁর প্রতি হিংসা-জ্বালায় অপরের কাছে তাঁকে তুচ্ছ প্রমাণ করার চেষ্টা করা অবশ্যই নিন্দনীয়।

অপরের সমালোচনা থেকে দূরে থাক। বিশেষ করে আন্দাজে-অনুমানে ধারণার বশবর্তী হয়ে কারো অন্যায় সমালোচনা করো না। সমালোচনা ন্যায় সংগত হলে ন্যায়পরায়ণতা ভুলে যেও না এবং তার জন্য মার্জিত ও ভদ্রোচিত ভাষা ব্যবহার কর। যথাসম্ভব তার ত্রুটিকে দৃষ্টিচ্যুত কর এবং কোন অজুহাত সন্ধান কর।

জীবনের সময় বড় মূল্যবান। কে কি ভুল করেছে সে সমালোচনায় আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং আমাদের কি করা উচিত সেই আলোচনা ও পরিকল্পনায় সময় ব্যয় করা।

সমালোচনা করা তো সহজ। কঠিন হল কাজ করা। সুতরাং পরের সমালোচনা করার আগে দেখ, তুমি কেমন? তুমি চালনি হয়ে ছুঁচের ছিদ্রের বিচার করছ না তো?

আবূ উবাইদাহ বলেন, ভরা মহফিলে খবরদার কারো ভুল ধরো না। কারণ, সে তো তোমার নিকট থেকে উপকৃত হবে, অথচ তুমি তার শত্রু হয়ে যাবে।

কেউ তোমার সমালোচনা করলে এবং তা ন্যায়সঙ্গত ও গঠনমূলক হলে সাদরে বরণ কর। অন্যথা তার উদ্দেশ্যে বল, 'তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

ইমাম শাফেয়ী বলেন, যদি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দিই এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখি, তাহলে কারো শত্রুতার দুশ্চিন্তা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে পারি।

জীবনের বহু শিক্ষার মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তুমি লক্ষ্য করে দেখো,

ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীরা আগুন দিয়ে আগুন নিভায় না। মন্দ দিয়ে মন্দ দূরীভূত হয় না।

জেনে রেখো যে, শ্রদ্ধা করতে জানলেই অন্যের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়।

জেনে রেখো যে, তোমার শিক্ষা অনুযায়ী কর্ম এবং ইল্‌ম অনুযায়ী আমল হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

কুরআন ও হাদীসের তথা জ্ঞানের আলোকে থেকে যদি কেউ আলো না পায়, তাহলে সে হতভাগা বৈ কি? মিঠা পানির নদীতে নৌকার হাল বেয়ে যদি কেউ পিপাসিত থেকে যায়, তাহলে বড় আফশোসের কথাই বটে। মরণ আসার পূর্বেই সে মৃত। কবি বলেন,

'শক্তি-সিন্ধুর মাঝে রহি হায় শক্তি পেল না যে,
মরিবার বহু পূর্বে জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।'

এমন শিক্ষিত সেই ফলের ঝুড়ির মত, যে ফলের স্বাদ-রস সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়, এমন পাথরের মত যে পানিতে ডুবে থেকে পানি গ্রহণ করে না।

'ফল পাইয়াছ পাওনিকো রস হায়রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝরনায় ডুবি রস পায় নাকো নুড়ি!'

তার অবস্থা তো তাদের মত, যাদের কথা মহান আল্লাহ বলেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥) سورة الجمعة

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা জুমুআহ ৫ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন কোন সদাচরণে লোককে আদেশ দিও না, যা তুমি নিজে কর না। কারণ, তা করা বড় লজ্জাকর ব্যাপার। উপদেশ করলে নিজেকে সর্বাগ্রে কর। নিজে নমুনা ও আদর্শ হয়ে আদেশ করলে তুমি হবে অনুসরণীয়।

হযরত আলী ﷺ বলেন, আমল না থাকলে বক্তার কোন মঙ্গল নেই। তুমি যদি বক্তা হও অথচ আলেম না হও, তাহলে তোমার উদাহরণ হল সেই পা; যার জুতা নেই। আর তুমি যদি আলেম হও এবং আমল না কর, তাহলে তুমি হলে সেই জুতার মত; যার ব্যবহারের পা নেই।

তিনি আরো বলেন, তুমি তার মত হয়ো না যে বিনা আমলে পরকালের সুখ আশা করে এবং দীর্ঘ কামনার জন্য তওবায় দেরী করে। দুনিয়া সম্বন্ধে সংসার-বিরাগীর মত কথা বলে, অথচ কাজ করে দুনিয়াদারের মত। পার্থিব সম্পদ পেলে তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। মানুষকে সেই কথার উপদেশ দেয় যা সে নিজে পালন করে না। নেক লোকদের ভালোবাসে, কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণা করে, অথচ সে তাদেরই একজন। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করে এবং যার জন্য মরণকে ভয় করে তাতেই অবিচল থাকে!

যে ব্যক্তি নিজেকে জনসাধারণের ইমাম বা নেতা মনে করে তার উচিত, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া এবং মুখের দ্বারা আদব দেওয়ার পূর্বে কর্ম, আচরণ ও চরিত্র দ্বারা আদব দান করা।

ইবনুল জাওযীকে এক ব্যক্তি বলল যে, আগামী জুমআয় আপনি দাসমুক্তির ফযীলতের উপর খুতবা দিন। কিন্তু তিনি আগামী সপ্তাহে না দিয়ে দিলেন একমাস পরে। লোকটি বলল, এত দেরী করার কারণ কি? তিনি বললেন, আমার নিকট অর্থ ছিল না। একমাস ধরে অর্থ জমা করে একটি দাস মুক্ত করে তারপর আজ এই খুতবা দিলাম। তাতে আমি যা করি না, তা বলতে হলো না।

বীরের মত প্রতিজ্ঞা আর ভীরুর মত কাজ দেখালে নিজের মূল্য থাকে কোথায়? অতএব বক্তৃতা সব সময়ই কাজের ফলশ্রুতি হওয়া উচিত।

যা তুমি দেখাও তার চেয়ে বেশী তোমার থাকা উচিত। যা তুমি জান, তার তুলনায় তোমার কম কথা বলা উচিত।

আমলহীন আলেমের উপমা হল সেই দৃষ্টিহীন লোকের ন্যায়, যে অন্ধকার রাত্রিতে হাতে চেরাগ নিয়ে পথ চলে থাকে।

একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলে সে কি বলতে পারে?

একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি অপর একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। *(সা'দী)*

দুই ব্যক্তি চরম কষ্ট ও পরিশ্রম করে অথচ তাতে নিজে উপকৃত হয় না; প্রথম হল সেই ব্যক্তি যে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করে অথচ (কার্পণ্য করে) নিজে খায় না। আর দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তার আলোকে নিজের জীবনের অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে না। *(সা'দী)*

মানুষের জ্ঞান-বিদ্যা প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া লোকেদের প্যারাশুটের মত, তা না খুললে কোন লাভ নেই।

শিক্ষা করেও যে তার অপপ্রয়োগ করল, সে যেন সুখের সামগ্রী জমা করে অগ্নিদাহ করল। *(সা'দী)*

যে আলেম অথচ তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল নেই, তার উপমা হল একজন এমন অন্ধ, যে রাতের অন্ধকারে হাতে প্রদীপ নিয়ে পথ হাঁটে। *(সা'দী)*

বেআমল আলেম, যেমন বিনা মধুর মৌচাক। *(সা'দী)*

যে ইল্‌ম শিখল অথচ তদনুযায়ী আমল করল না, সে সেই চাষীর মত, যে জমিতে চাষ দিল এবং তাতে কোন কিছু রোপন করল না। *(সা'দী)*

মুনাফিকের ইল্‌ম তার মুখে এবং মু'মিনের ইল্‌ম তার আমলে।

আদবের ফল সঠিক জ্ঞান এবং ইলমের ফল নেক আমল।

যত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, যদি তার দ্বারা সে নিজে উপকৃত না হতে পারে, তবে এমন শিক্ষিতকে মূর্খ বলে আখ্যায়ন করলে অন্যায় হবে না। *(সা'দী)*

জাহেল আলেম থেকে উত্তম; যদি আলেম অসৎ কাজ না করে। কারণ, জাহেল অন্ধ অবস্থায় পথ ভুল করে। পক্ষান্তরে আলেমের দু'টি চোখ থাকা সত্ত্বেও কুয়োতে গিয়ে পড়ে। *(সা'দী)*

বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

মানুষ যদি নিজের দেমাগ না খাটায়, তাহলে এমন দিন আসবে যে, সে সময় সে খাটাতে গিয়ে তার দেমাগ কাজ করবে না। কুঁয়োর পানি না তোলা হলে আপনিই তা নষ্ট হয়ে যাবে।

একটি প্রদীপ থেকে শত শত প্রদীপ জ্বালালে যেমন তার আলো কমে না, তেমনি শিক্ষার আলো যত বেশী দান করা যায় ততই মঙ্গল।

জ্ঞানই একমাত্র মহামূল্যবান সম্পদ, যা খরচ করলে কখনো কমতি পড়ে না।

পরিচিত অনেকে হতে পারে, কিন্তু সুপরিচিত হতে অতিরিক্ত গুণের দরকার। অনুরূপভাবে শিক্ষিত অনেকেই হয়, কিন্তু সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য আছে। অনেকে শিক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না। যেহেতু প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য ইল্‌ম অনুযায়ী আমল ও শিক্ষা অনুযায়ী কর্মের প্রয়োজন আছে।

তোমার জ্ঞান ও শিক্ষা যদি তোমাকে অসঙ্গত কর্মে বাধা দেয়, তাহলে তুমি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষ।

চরিত্রের মাঝে যদি সত্যের শিখা দীপ্ত না হয়, তাহলে জ্ঞান, গৌরব, আভিজাত্য, শক্তি সবই বৃথা। *(মওলানা রুমী)*

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দিবে তারে শিক্ষা?'

হে নবীন শিক্ষার্থী! কবির সুরে সুর মিলিয়ে সবচেয়ে সুন্দর জীবন গড়ার জন্য পণ ও প্রতিজ্ঞা কর ঃ-

'এই করিনু পণ মোরা এই করিনু পণ,
ফুলের মত গড়ব মোরা মোদের এই জীবন।
হাসব মোরা সহজ মুখে
গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে
মোদের কাছে এলে সবার জুড়িয়ে যাবে মন।
নদী যেমন দুই কূলে তার বিলিয়ে চলে জল,
ফুটিয়ে তোলে সবার তরে শস্য, ফুল ও ফল।

তেমনি করে মোরাও সবে
পরের ভাল করব ভবে
মোদের সেবায় উঠবে হেসে এই ধরণী তল।
সূর্য যেমন নিখিল ধরায় করে কিরণ দান,
আঁধার দূরে যায় পালিয়ে জাগে পাখির গান।
তেমনি মোদের জ্ঞানের আলো
দূর করিবে সকল কালো
উঠবে জেগে ঘুমিয়ে আছে যে সব নীরব প্রাণ।'

শিক্ষার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয়

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্য চাই যথোচিত সময়, চাই যথেষ্ট পরিমাণের পরিশ্রম। ধৈর্যের সাথে পরিশ্রম না করলে সুফল লাভ করা যায় না। আরবীতে বলে,

من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن قرع الباب ولَجَّ ولج.

অর্থাৎ, যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে সে ফল পায়। যে বপন করে, সে কর্তন করে। যে দরজায় আঘাত করে এবং নির্বিচল থাকে সে প্রবেশ করে।

বলাই বাহুল্য যে, তোমার শিক্ষার পথে শ্রম ব্যয় করতে হবে, যেমন ব্যয় করতে হবে যথেষ্ট সময়। মূসা নবী জ্ঞান শিক্ষার জন্য বের হয়ে বলেছিলেন, দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামবো না,আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

তিনি পথ চলতে চলতে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ আমাদের নাস্তা আনো, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

তাঁর ওস্তাদ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।

কিন্তু তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবো না। *(সূরা কাহফ দ্রষ্টব্য)*

সুতরাং তোমাকেও তোমার পথে মেহনত করতে হবে। আরবী কবি বলেন,

بقدر الكد تكتسب المعـــالى + ومن طلب العلا سهر الليالي

ومن رام العـــلا من غير كد + أضاع العمر في طلب المحـــال

تروم العـــز ثم تنـــام لـــيلاً + يغوص البحر من طلب اللآلي

تركت النوم ربي في الليـــالي + لأجل رضاك يا مولى المـــوالي

فوفقـــني إلى تحصـــيل علـــم + وبلغـــني إلى أقـــصى المعـــالي

অর্থাৎ, মেহনত অনুপাতে মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি উন্নতি খোঁজে তার উচিত, রাত্রি জাগরণ করা। যে ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে উন্নতি কামনা করে সে তো দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে আয়ু ক্ষয় করে। তুমি ইজ্জত চাইবে অথচ রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবে (এ তো হতে পারে না)। কারণ, যে মণি-মুক্তা পেতে চায় তাকে তো সমুদ্রে ডুব দিতে হবে।

হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাত্রিসমূহে নিদ্রা বর্জন করেছি হে সকল প্রভুদের প্রভু! তাই আমাকে ইল্‌ম অর্জন করার প্রেরণা দান কর এবং মর্যাদার শেষ চূড়ায় পৌঁছে দাও।

তবে ফুল-বিছানো পথ তোমাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে না। শিক্ষা শিখতে হলে কষ্টের শিখায় ধৈর্য ধরতে হবে। শিক্ষার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ। অতএব কাঁটা দেখে ফুল তুলতে পিছপা হয়ো না। পথের দৈর্ঘ্য কল্পনা করে পথ চলতে পিছপা হয়ো না।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'
'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

অতএব কষ্টের পথে উদ্যম রেখে ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধর; আগত বিপদে, আল্লাহর নির্দেশিত ফরয পালনে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করার ব্যাপারে।

তুমি তোমার জীবনে এ তিন প্রকার ধৈর্য ধারণ করতে পারলে মিঠা ফল লাভ করতে পারবে। বিভিন্ন আপদে, বিপদে, আঘাতে, বাধাতে সবর করলে অবশ্যই মেওয়া ফলবে।

জেনে রেখো যে, পশুপক্ষী এমনিতেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ বহু চেষ্টায় মানুষ। সুতরাং চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া তুমি সফলতার স্বপ্ন দেখো না।

পথে প্রতিবন্ধকতা এলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর। সম্মুখের বাধাকে উল্লংঘন কর। আর মনে রেখো যে, তোমার উন্নতির পথে ৫টি প্রতিবন্ধক আছে; আলস্য, অবৈধ ও অতিরিক্ত নারী-প্রেম, অসুস্থতা, দেশের টান এবং আত্মগর্ব।

তুমি যদি গরীব হও, তাহলে এস! শিক্ষার মাধ্যমে তুমি তোমার গরীবী দূর কর। অভাবের তাপে তপ্ত না থেকে জ্ঞানের শীতলতা লাভ করে তোমার সেই অভাব মোচন কর। আর জেনে রাখ যে, প্রকৃত নিঃস্ব হল সেই ব্যক্তি, যার পকেটে টাকা থাকলেও পেটে বিদ্যে নেই।

তুমি যদি এতীম হও, তাহলে এস! শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রাচুর্য দিয়ে তোমার এতীমত্বকে দূরীভূত কর। আল্লাহ যদি তোমার নিকট থেকে পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়েরই স্নেহ কেড়ে নিয়েছেন, তাহলে তাতে তুমি দুঃখ না করে, অভিযোগ না করে, আল্লাহকে নারাজ না করে, নির্জনে চোখের পানি না ফেলে তোমার শিক্ষা ও বিদ্যা দ্বারা মানুষের নিকট থেকে স্নেহরাশি সংগ্রহ কর। আর জেনে রাখ যে, আসল এতীম হল সেই ছেলে, যে ইল্‌ম, আদব ও শিক্ষার ব্যাপারে এতীম। এতীম হয়ে তুমি তোমার এতীম নবীর কথা খেয়াল কর, দুঃখে সান্ত্বনা পাবে।

আর কষ্টের কথা বলছ? কষ্টের প্রতাপকে পদদলিত করে বিজয়ী হও। যেহেতু জীবনে কষ্ট না পেলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। জীবনে যাঁরা বিজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের জীবনে দুঃখ কষ্ট বেশী ছিল।

অতএব জ্ঞানীদের কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং তোমাকেও তাঁদের মত কষ্টকে জয় করে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

'ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!' (রবী)

তুমি যদি দৃষ্টিহীন অন্ধ হও, তাহলে তাতে দুঃখের কিছু নেই। এস! জ্ঞান ও শিক্ষার আলো দিয়ে তোমার তৃতীয় নেত্রকে দৃষ্টিশক্তি দাও। যে সমাজে তুমি অবহেলিত, সেই সমাজকে তুমি জানিয়ে দাও, আসল অন্ধ তো সেই ব্যক্তি, যার দুটি নেত্র থাকলেও তৃতীয় নেত্র নেই; যার জ্ঞান ও শিক্ষা নেই।

আর সুসংবাদ নাও। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেশ্ত্ দান করি।" *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

সময় অমূল্য ধন

কোন্ সে জিনিস, যা খুব সংকীর্ণ; আবার খুব প্রশস্ত এবং দীর্ঘও?

কোন্ সে জিনিস, যা দ্রুতগামী; আবার মৃদুগামীও?

কোন্ সে জিনিস, যা আমরা নষ্ট করে ফেলি, অতঃপর তার উপর আফশোস করি?

কোন্ সে জিনিস, যা ব্যতিরেকে কোন কিছু সম্পন্ন হওয়া বা ঘটা সম্ভব নয়?

কোন্ সে জিনিস, যা প্রত্যেক ক্ষুদ্রকে গিলে খায় এবং প্রত্যেক বৃহৎকে সুবৃদ্ধি দান করে?

কোন্ সে জিনিস, যার কসম খেয়েছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা?

কোন্ সে জিনিস, যাকে তুমি আয়ত্তে না আনতে পারলে, সে তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবে?

তা হল সময়; যার প্রতি আমরা অনেকে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করি এবং অনেক সময় তার প্রতি গুরুত্ব দিই না ও ভ্রূক্ষেপ করি না।

তা হল সময়; যা অনেকের নিকট এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ থাকে যে, তা কাটতে চায় না, কাটাতে হয়। আবার অনেকের নিকট তা না থাকার ফলে কিনতে চায়, কিন্তু তা কিনতে পাওয়া যায় না।

মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর উচিত, সময়ের যথোচিত কদর করা, সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করা। কারণ, সময়ই হল জীবন। অতএব যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালোবাসে, সে ব্যক্তির উচিত, সময়ের অপচয় না করা।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আসলে কতকগুলি দিনের সমষ্টি। সুতরাং যখনই তোমার একটি দিন চলে যায়, তখনই তোমার (জীবনের) একটা অংশ ধ্বংস হয়ে যায়।'

সময়ের গুরুত্ব আছে বলেই মহান আল্লাহ কুরআনে সময়ের কসম খেয়েছেন।

আর সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে মহানবী ﷺ আমাদেরকে অনেক কথাই বলেছেন; তিনি বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

"যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩ নং)*

"দু'টি নেয়ামত এমন আছে; যার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে। আর সে দু'টি নেয়ামত হল সুস্থতা ও অবসর।" *(বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

"পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের যথার্থ সদ্ব্যবহার করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে, বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে এবং দরিদ্রতার পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১০৭৭ নং)*

আর বাস্তব কথা হল এই যে, ইসলামী অভিধানে 'অবসর' বা 'অবকাশ' বলে কোন শব্দ নেই। কারণ, মুসলিমের জীবন হল কাজে-কাজে পরিপূর্ণ। দুনিয়ার কাজ না থাকলে দ্বীনের কাজে, সংসারের ব্যস্ততা না থাকলে পরকালের চিন্তায়, লেখাপড়া বা ইল্‌ম অনুসন্ধানের কাজে সে সব সময় ব্যস্ত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} (٨) سورة الشرح

অর্থাৎ, অতএব যখন তুমি অবসর পাও তখন পরিশ্রম কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর। *(সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)*

যাঁরা সময়ের কদর করে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ; তিনি বলেন, 'যেদিন সূর্যাস্ত গেল, সেদিন আমার জীবনের একটি দিন কম হয়ে গেল, অথচ আমার আমল বৃদ্ধি পেল না। এর ফলে আমি এত অনুতপ্ত হলাম যে, এর মত অনুতপ্ত আমি অন্য কিছুতে হইনি।'

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'প্রত্যহ ফজর উদয়ের সময় আল্লাহর তরফ থেকে এক আহবানকারী আহবান জানিয়ে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার আমলের সাক্ষী। সুতরাং আমার নিকট থেকে নেক আমল পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করে নাও। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর আমি ফিরে আসব না।'

বলাই বাহুল্য, জ্ঞানীর উচিত, সময় নষ্ট হতে না দেওয়া। কারণ, সময় নষ্ট হওয়া কর্ম নষ্ট হওয়ারই নামান্তর। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই নেই।

যাঁরা কর্ম করতে চান, যাঁদের জীবনে ব্যস্ততা আছে, সেই কর্মশীল মানুষরা যা বলেন তা আমরা শুনে থাকি ঃ-

ওহ! সময়টা কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।
হায়! দিনটা যদি ২৪ ঘন্টার না হয়ে ৩৬ ঘন্টার হতো।
আমি দুঃখিত। আমার হাতে সময় নেই।
সময় তো ফুরুৎ করে পার হয়ে গেল।
সময়টি যায় তোফা ঘোড়ার মত ছুটে।
সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।
সময় খেয়াল কর! সময় শেষ।
সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়---

সময় হল তরবারির মত। তুমি তাকে কাটতে না পারলে, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ মূল্য থেকে টাকা-পয়সার মূল্যের পার্থক্য আছে। টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা যায়, ধার দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে ধার নেওয়া যায়। কিন্তু সময় ধার দেওয়াও যায় না এবং ধার নেওয়াও যায় না।

সময় আর অর্থের ব্যাপারে একটি মৌলিক সত্য হলো দুটোই আমাদের খুব বেশী প্রয়োজন। এত বেশী প্রয়োজন যে, সে চাহিদা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। যত পাই ততই মনে হয়, আরো কিছু টাকা হলে ভালো হত, আরো কিছু সময় পেলে ভালো হত---।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন একদা বই বিক্রয়ের সময় দাম বললেন, ১ ডলার। ক্রেতা কিছু সময় ধরে দাম কমাবার চেষ্টা করলে বললেন, সওয়া এক ডলার। আরো কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর ক্রেতা বলল, আপনি দাম কমানোর জায়গায় বাড়ান কেন? বললেন, এখন বইটির দাম দেড় ডলার। আপনি আমার যে সময় নষ্ট করছেন তারই দাম ধরে নিচ্ছি!

'জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়।
বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়, নাই নাই।' (মাইকেল)

যাঁরা মহান, যাঁদের আছে মহান উদ্দেশ্য, তাঁদের হাতে সময় মোটেই থাকে না। পক্ষান্তরে যাঁরা কর্মবিমুখ, যাঁদের জীবনের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁদের সময় কাটতেই চায় না। আর তাঁদেরকেই 'অবসর-বিনোদন' করতে হয়।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে প্রত্যহ ২৪টি ঘন্টা। কিন্তু কেউ তা কাজে লাগায় এবং কেউ তা নষ্ট করে ফেলে। কারো সময়ে বর্কত থাকে, কারো থাকে না।

অধিকাংশ মানুষই সময়কে কাজে না লাগিয়ে কালের গভীর অন্ধকারে তলিয়ে হারিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর মানুষ সময়কে কাজে লাগিয়ে মরেও অমর হয়ে আছেন। ইতিহাস তাঁদেরকে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

জেনে রেখো যে, প্রত্যেকের জীবনে যে সময় আছে, তা যদি সঠিকভাবে ব্যয় না করতে পারা যায়, তাহলে তা অপচয় হয়। পক্ষান্তরে যথানিয়মে ব্যয় করলে, একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে কাজ করলে সময়ের বর্কত পাওয়া যায়। আসলেই সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা আরো দশটা কাজ বেশী করার পথ দেখিয়ে দেয়।

তোমার জীবনে যে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে সময় নষ্ট হয় তাকেই তুমি 'সময়-চোর' নামে অভিহিত করতে পার। তোমার লক্ষ্যস্থলে সঠিকভাবে পৌছতে যে জিনিস বাধা সৃষ্টি করে অথচ সেই ফাঁকে যে সময় অবাধে তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই জিনিস চিহ্নিত করতে পারলে, তুমি সময়ের অপচয় বন্ধ করতে পারবে।

কিছু সময়-চোর আছে তোমার নিজের ভিতরে; যাকে তুমি নিজে নিজেই দমন করতে পার। যেমন ঃ-

(ক) তোমার কাজে সাজ-গোছ বা পারিপাট্য না থাকা

যে কাজটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে আগে না করা।

এক সঙ্গে অনেক কাজ করতে যাওয়া।

কাজের সঠিক নিয়ম-নীতি না জানা অথবা সঠিক নিয়মানুসারে কাজ না করা অথবা কাজের কায়দা না জানা।

যেখানে যে জিনিস গুছিয়ে রাখা দরকার সেখানে তা ঠিকমত না রাখলে প্রয়োজনে তা খুঁজে বের করতে অনেক সময় নষ্ট হয়। একটি কলম খুঁজতে অনেকের ১০ থেকে ১৫ মিনিট কিংবা তারও বেশী সময় নষ্ট হয়ে থাকে।

ফালতু বা অজরুরী কাজ করতে গিয়ে জরুরী কাজে আর সময় পায় না অনেকে।

একই সঙ্গে একাধিক কাজ করতে গিয়ে কোনটাই হয়ে ওঠে না অনেক ক্ষেত্রে। আর তার ফলে ফালতু সময় নষ্ট হয়। যে অনেক কিছু এক সঙ্গে আরম্ভ করে, সে কিছুই শেষ করতে পারে না; সময় যায় বেকার। আর এ জন্যই একই সময়ে সব কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বোকামি করা হয়।

আখেরাতের কাজ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করে সময় ও মেহনত বরবাদ করে অনেকে।

(খ) দীর্ঘসূত্রতা, গয়ংগচ্ছ, কুড়েমী, আলস্য প্রভৃতি। পরে করব, কাল করব, আগামীতে দেখা যাবে ইত্যাদি বলে কাজ রেখে সময় নষ্ট করে অনেকে।

'সদা ভয় সদা লাজ   কিছুই করিতে পারি না কাজ
মনের মাঝে শঙ্কা শুধু   পাছে লোকে কিছু গায়,
আজ করব না করব কালি   এইভাবে দিন গেলই খালি
এক পা কেবল পাড়ে আছে   এক পা আছে নায়।'

(গ) ওযর ও অজুহাত পেশ না করতে পারা। অনেকের মন রক্ষা করতে গিয়ে তার সাথে বাজে কাজ বা অহেতুক চিত্তবিনোদনে সময় নষ্ট হয়ে থাকে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে 'না' বলে ওযর পেশ না করতে পেরে সময় নষ্ট করে অনেকে।

(ঘ) অতিরিক্ত চিত্তবিনোদন; টিভি, খেলা ইত্যাদিতে অনেক সময় নষ্ট হয়।

বলাই বাহুল্য যে, সচেতনতা অবলম্বন করে যদি ঐ ৪টি চোর থেকে সাবধান হতে পার, তাহলে তোমার সময় নষ্ট হবে না এবং তোমার অধ্যয়ন কাজে বর্কত হবে।

কিছু 'সময় চোর' আছে বাইরের; তোমার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমনঃ-

(ক) অবাঞ্ছিত সাক্ষাৎকারী।
(খ) অবাঞ্ছিত দূরালাপ (টেলিফোন)।
(গ) অপ্রয়োজনীয় পত্রালাপ।
(ঘ) অজরুরী বৈঠক, মিটিং বা সমাবেশ।
(ঙ) আকস্মিক বিপদাপদ।
(চ) অপেক্ষা ও প্রতীক্ষা।

উক্ত সময়-চোরগুলিকে দমন করা সহজ নয়। যেহেতু তা তোমার নিজস্ব ব্যাপার নয়। অবশ্য শেষোক্ত চোরটির নিকট হতে ইচ্ছা করলে সময় কেড়ে নিতে পার। আর তা এইভাবে যে, স্টেশন, প্রতীক্ষালয়, বাস-ট্রেন-প্লেন, হাসাপাতাল, ডাক্তারখানা, ব্যাংক, কোর্ট-কাছারী বা অন্য কোন অফিস ইত্যাদিতে বসে বসে যে সময় নষ্ট হয় তা হতে দিও না। এই সময়গুলিতে তুমি সঙ্গে কোন বই রেখে পড়তে থাক অথবা লাইব্রেরী ইনসার্ট করা আছে এমন মোবাইল খুলে পড়াশোনা কর। সঙ্গে তা রাখা সম্ভব না হলে মুখস্থ পড়া রিপিট কর। তা না থাকলে বা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহর যিক্র করতে থাক। যাতে তোমার সময়ের কাগজ বিনা প্রিন্টে সাদা থেকে না যায়; বরং কোন না কোন উপকারী কাজে তা চিত্রিত ও মুদ্রিত হয় এবং তা দেখে আজ দুনিয়াতে ও কাল কিয়ামতে নিরতিশয় আনন্দে আনন্দিত হতে পার।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় এক উস্তায বলতেন, আমরা ছাত্রজীবনে মোটেই সময় নষ্ট করতাম না। এমনকি পায়খানা করতে বসেও আরবী গ্রামারের সূত্র মুখস্থ পড়তাম। সত্য কথা এই যে, তাঁরই অনুপ্রেরণাতে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত হই এবং তার ফলে অনেক 'সময়-চোর' লোকের কাছে আমি ভালোও নই।

সময় আর কোথায়? জীবনের দিনগুলি কতকগুলি সেকেন্ডের ন্যায়। যা ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের সাথে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তা কি আর ফিরে পাব? ঘড়ি যেন সর্বদা বলতেই আছে,

টিক্-টিক্ টিক্-টিক্
কাজ করে ফেল ঠিক।
সময় হতেছে পার,
ফিরে চাও বারবার।
ভুল জীবনের রঙ,
ঘড়ি বলে ঢং ঢং।

আরবী কবি বলেন,

دقات قلب المـــرء قائلـــة له   إن الحيـــاة دقـــائق وثـــواني

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها   فالذكر للإنسان عمر ثاني

অর্থাৎ, মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন সদা যেন বলেই চলেছে, জীবন তো কয়টা মিনিট ও সেকেন্ডের নাম। সুতরাং তুমি তোমার মরণের পর জীবনের সুনামকে উচ্চ কর। যেহেতু সুনাম হল মানুষের দ্বিতীয় জীবন।

অতএব সময়ের কদর করতে শিখ, জীবনে সাফল্য লাভ করবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সময় বাঁচাতে গিয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাজ করা হতে বিরত থাকবে এবং তাতে হকদারের হক নষ্ট করবে। যেহেতু আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "--- তুমি রাত্রে ঘুমাও এবং নামাযও পড়, প্রত্যেক দিন রোযা না রেখে মাঝে মাঝে রাখ। যেহেতু তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহেমানের হক আছে, তোমার উপর তোমার বন্ধুর হক আছে এবং তোমার উপর তোমার সাক্ষাৎকারীরও হক আছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "--- তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের হক আছে --- অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান কর।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান প্রভৃতি)*

বলাই বাহুল্য যে, তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সময়কে সাজিয়ে-গুছিয়ে এমনভাবে ব্যয় কর, যাতে কোন প্রকার অপব্যয় ও অপচয় না ঘটে

এবং না-ই তাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা কমতি দেখা দেয়।

প্রত্যহ লাভ-নোকসান খতিয়ে দেখে সতর্কতার সাথে ভেবে দেখ, তুমি তোমার ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে কতটুক কাজে লাগাতে পারলে। সুতরাং আজকের হিসাবে যা নোকসান গেল তা যেন আগামীতে না যায় এবং আজকে যে সময় নষ্ট হয়ে গেল তা যেন আগামীতে আর না যায়, তার প্রতি বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হও; তাহলেই সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে।

সারা দিনের কিছু সময় আছে, যখন মন ফ্রেশ ও স্ফূর্তিময় থাকে। পক্ষান্তরে কিছু সময়ে আলস্য ও গাফলতি থাকে। যে কাজগুলি তোমাকে ভারি লাগে অথবা অধিক মনোযোগ দরকার সেই কাজগুলিকে প্রথম সময়ে এবং হাল্কা ও চিত্তাকর্ষী কাজগুলোকে দ্বিতীয় সময়ে করতে অভ্যাসী হও; তাহলেই তুমি হবে কাজের কৃতার্থ কাজী।

জেনে রেখো যে, সময় সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে নির্দিষ্ট করা আছে। সে সময়কে বর্ধিত করা যায় না, প্রজন্মের মাধ্যমে বৃদ্ধি করাও যায় না। সময় চলমান, ক্ষণেকের জন্যও থামে না। যাকে পিছনের দিকে ফিরানোও অসম্ভব এবং আগের দিকে অগ্রসর করাও সাধ্যাতীত। যার কোন pause, forward, reverse নেই। সময় নিজের গতিতে আগের দিকে প্রবাহমান। অতএব তার সাথে তুমি তোমার জীবনকে গতিময় কর। গতিশীল সময় দ্বারা উপকৃত হও এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। মনে রেখো যে, যে সময় একবার হাতছাড়া হয়, তা জীবনে আর ফিরে আসে না।

দিনের সবচেয়ে মধুরতম সময় হচ্ছে ভোর বেলা। এই সময়ের অপচয় ঘটিও না। যা করা দরকার তার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে কর, যা পড়া দরকার, তার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পড়া আগে পড়। আর পত্র-পত্রিকা পড়ায় বেশী সময় নষ্ট করো না।

সবশেষে বলি যে, জীবনকে যদি তুমি ভালোবাস, তাহলে সময়ের অপচয় করো না। কারণ জীবনটা সময়ের সমষ্টি দ্বারা তৈরী।

বই পড়ার গুরুত্ব

যে তার ইমারত উঁচু করতে চায়, তার উচিত, ভিত্তি মজবুত করা। যে চায় বড় কিছু হতে, তার উচিত, বই পড়ে পড়ে নিজের ভিত মজবুত করা।

বই পড়া বুদ্ধির ব্যায়াম স্বরূপ। ব্যায়াম যেমন শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখে, বই পড়াও তেমনি ব্রেনকে সক্রিয় করে তোলে। এই জন্য ছাত্রের উচিত, সর্বদা কাছে বই রাখা এবং সময় নষ্ট না করে অবসর সময়ে কেবল বই পড়া আর বই পড়া।

জ্ঞানীগণ এ কথার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন,

'তোমার সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী হল কিতাব।'

'বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোন দিন ঝগড়া হয় না।'

'একটি ভাল বই আজকের এবং ভবিষ্যতের বন্ধু।'

'আমার মধ্যে যদি উত্তম বলে কিছু থাকে, তবে আমি বই-এর কাছে ঋণী।'

'তিনটি কাজ না করলে বুদ্ধির বৃদ্ধিলাভ হয় না; নিরন্তর চিন্তা-গবেষণা করা, চিন্তাশীলদের লিখিত বই-পুস্তক পড়া এবং জীবন-যাত্রায় অভিজ্ঞতা লাভের সময় সজাগ থাকা।'

আর বই পড়লেই তো হয় না। বই বুঝে পড়তে হয়। সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এবং সজাগ মন নিয়ে বই পড়তে হয়। যেহেতু ভালো বই-এর চাইতে একজন ভালো পাঠক বড় দুর্লভ।

সুতরাং এ কথাও তোমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখো যে, তিনটি ভালো বই পড়ার চাইতে একটি ভালো বই তিনবার পড়া ভালো।

যাঁরা বই পড়ে এ দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হল।

খতীব বাগদাদী যখন শামদেশ সফর করেন তখন তিনি তিন মাসের ভিতরে টীকা লেখা সহ ১০০টি মোটা মোটা বই পড়েন।

আস্‌সাহেব খুব কিতাব ভালোবাসতেন। কিতাব কিনতে কিনতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তা কোথাও বহন করার দরকার হলে ৪০০ উঁট লাগত। *(আস্‌সিয়ার ১৬/৫১৩)*

শায়খ আহমদ হাজ্জার কিতাব ভালোবাসতেন খুব। একদিন এক জায়গায় একটি কিতাব বিক্রি হতে দেখলেন। কিন্তু তাঁর নিকট দিরহাম ছিল না। তাঁর দেহে যে লেবাস ছিল তার কিছু বিক্রি করে সাথে সাথে সে কিতাবটি খরীদ করেছিলেন! *(উলুউবুল হিম্মাহ ১৯১পৃঃ)*

যুবাইর বিন আবী বাকর বলেন, 'একদা আমার ভাগ্নী আমার স্ত্রীকে বলল, আমার মামা মামীর পক্ষে কত ভালো মানুষ; মামীর উপর সতীন আনেনি, আর কোন দাসীও ক্রয় করেনি। তা শুনে স্ত্রী তাকে বলল, 'আল্লাহর কসম, এই বইগুলো আমার পক্ষে তিনটে সতীনের চেয়েও অধিক কঠিন!' *(আল-জামে' লিআখলাকির রাবী আদাবিস সামে' ১/৯৯)*

আল্লামা আলবানী নিজের দোকান বন্ধ করে যাহেরিয়া পাঠাগারে ১২ ঘন্টা কিতাব মুতালাআহ করতেন। *(ইতহাফুল ইখওয়ান বিআহাম্মিয়াতিল ক্বিরাআহ ১২-১৪পৃঃ)*

'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে,
আনাড়ীর ঘোড়া লয়ে সুনুড়ীতে চড়ে।'

ছাত্রের পানাহার

আরবীতে একটি কথা আছে,

عقل سليم في جسم سليم.

অর্থাৎ, সুস্থ দেহে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকে। আর তার জন্যই ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত ও পরিমিত পানাহার করার গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অধিকাংশ খাদ্য মানুষ খেয়ে থাকে মজা লাগে তাই। কিন্তু কিছু খাদ্য গ্রহণ করতে হয় শরীর ও ব্রেনের জন্য উপকারী তাই। পক্ষান্তরে কিছু খাদ্য আছে যা

ভক্ষণ করা উচিত নয়। যেহেতু তা অবৈধ অথবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার খাও। সকালে নাশ্তায় ভরপেট খাও। দুপুরেও খাও রাজার মত। কিন্তু রাত্রে ভিখারীর মত অল্প পরিমাণ আহার কর। এই নিয়মে পানাহার করলে সকালে ও দুপুরে ভক্ষিত খাবার পেটে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সারা দিনে সেই শক্তি ব্যয় ও ক্ষয়ও হবে। কিন্তু রাত্রে ভুঁড়িভোজন করলে তাতে শক্তি সঞ্চয় হবে এবং ঘুমিয়ে থাকার ফলে তা চর্বিরূপে দেহে জমে থেকে যাবে। আর তাতে ভুঁড়ি বাড়বে এবং হার্ট-এ্যাটাক, স্টোক প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

তাছাড়া প্রতিনিয়ত পানাহারের সময় তোমার আদর্শ মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ মেনে চল, সুস্বাস্থ্য পাবে ও ভালো থাকবে।

তিনি বলেন, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১২১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

ইসলামে খাবারের অন্যান্য আদব জেনে তা মানার চেষ্টা কর, উপকৃত হবে।

প্রতিদিন দেড় লিটার বা ছয় গ্লাস পানি পান করা উচিত।

মৌসমী ফলের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল খাওয়া উচিত।

টিন, ডিব্বা বা প্রক্রিয়াজাত খাবার মোটেই খাবে না।

রঙ মিশানো খাদ্য ও পানীয় মোটেই খাবে না।

পক্ষান্তরে মাদকদ্রব্য বর্জন কর। বিড়ি-সিগারেট, গুল-গুরাকু, তামাক-জর্দা ইত্যাদি নিশা জাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে থাক।

পানীয়র মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পানীয় হল ডাবের পানি। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। তারপর রয়েছে কাগজী লেবুর শরবত।

শরীরচর্চা

মেধা তৈরী করার জন্য যেমন সুস্থ শরীর দরকার, সুস্থ শরীরের জন্য দরকার পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্যের, তেমনি দরকার খাদ্য সঠিকভাবে হজম করা ও নিয়মিত পেশাব-পায়খানা করা। আর তার জন্য দরকার নিয়মিত পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম। পরন্তু যারা পরিশ্রমের কোন কাজ করে না তাদের জন্য - বিশেষ করে চাকরিজীবী এবং ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৈধ খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চা করা জরুরী।

অবশ্য সবারই কাছে খেলাধূলা বা ব্যায়াম চর্চা করা পছন্দনীয় নয়। অবশ্য যে লজ্জা করে অথবা তা গাম্ভির্যের পরিপন্থী মনে করে, তার উচিত লোকচক্ষুর অন্তরালে একাকী ব্যায়াম করা অথবা হাঁটার মাধ্যমে ব্যায়াম করা। যেহেতু সাইকেল চালানো এবং মাথা উঁচু করে দ্রুত হাঁটা এক প্রকার ভালো ব্যায়াম। আর এটি যে কোন লোকই করতে পারে।

নিয়মিত শরীর-চর্চা করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ব্রেন ফ্রেশ হবে এবং মন চাঙ্গা থাকবে। আর তা হলেই পড়াশোনায় ভালো মন বসবে।

জ্ঞাতব্য যে, মিশ্র-শিক্ষা বা ছেলে-মেয়ে একই সাথে বিনা পর্দায় ক্লাস করা ইসলামে বৈধ নয়। বৈধ নয় ছেলেদের সাথে অথবা পুরুষ শিক্ষকের সামনে মেয়েদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চা।

বিরতি ও বিশ্রাম

সুস্বাস্থ্যের জন্য আরাম ও বিশ্রামও জরুরী কর্ম। বিরতিহীন মেশিন যেমন বেশী দিন টিকে না অথবা অল্প দিনে খারাপ হয়ে যায়, ঠিক তেমনিই মানবদেহের মেশিনও। তারও বিরতি ও বিশ্রামের দরকার।

প্রতিদিন কমপক্ষে ৪/৬ ঘন্টা এবং বেশীপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুম শরীরের পক্ষে উপকারী। এর চাইতে কম বা বেশী ঘুম সুস্বাস্থ্যের জন্য অপকারী হতে পারে।

যাদের সময়ে ঘুম আসে এবং সময়ে ঘুম ভাঙ্গে তারা সত্যই ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাদের অসময়ে ঘুম আসে এবং সময়ে ঘুম আসে না, নিঃসন্দেহে তারা হতভাগা।

যারা অসময়ে ঘুমায়; যেমন রাতে না ঘুমিয়ে সকালে ঘুমায়, তারা ঘুমিয়ে তৃপ্তি পায় না। তাদের শরীর থেকে আলস্য ও ক্লান্তিভাব দূর হয় না। আর এ জন্যই যথাসময়ে ঘুমানোর বড় গুরুত্ব আছে।

কিন্তু যদি যথাসময়ে তোমার ঘুম না আসে?

আসলে সুনিদ্রার জন্য চিন্তা ও টেনশনমুক্ত ব্রেন ও পরিবেশ দরকার।

চেষ্টার পর রাত্রে ঘুম না এলে যত কুরআন ও শয়নকালের দুআ মুখস্থ আছে শুয়ে শুয়ে সব পড়ে শেষ করার চেষ্টা কর। 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পাঠ কর। তার পরেও ঘুম না এলে, ঘুম না হলে তোমার কোন ক্ষতি হবে -এমন ভেবো না। অথবা রাত পার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে মনে আক্ষেপ করো না। এমন ভাবলে ও করলে আরো ঘুম আসতে চাইবে না। অতঃপর একান্ত ঘুম যদি নাই আসে তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠে ওযু করে নামায পড়তে শুরু কর। এর মাঝে ঘুমের আবেশ পেলে শুয়ে পড়। ঘুম না এলে বিছানায় উল্টাপাল্টা করলে অন্যান্য দুআ পড়ার পর এই দুআ পড়,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহহার, রাব্বুস্ সামা-ওয়াতি অল্আরযি অমা বাইনাহুমাল আযীযুল গাফ্ফার।'

আর হ্যাঁ। ঘুমের ওযুধ ব্যবহার করে ঘুমাবার চেষ্টা করো না। কারণ, ঘুমের পর শরীরে যে তরোতাজা ভাব ও মনে স্ফূর্তি আসে, সে ঘুমের পর তা আসে না। বরং ওযুধ খেয়ে ঘুমানোর ফলে শরীরে এক ধরনের ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভূত হতে থাকে।

জেনে রেখো যে, ক্ষতিকারক নিদ্রা, চিৎ হয়ে শয়ন করে নিদ্রা যাওয়া। আর

তার চেয়েও ক্ষতিকর নিদ্রা হল উবুড় হয়ে নিদ্রা।

উবুড় হয়ে শয়নকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ পছন্দ করেন না। *(আহমদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

স্বাস্থ্যবিদ্গণ বলেন, চারটি জিনিস স্বাস্থ্য ধ্বংস করে; দুশ্চিন্তা, শোক, উপবাস ও অনিদ্রা।

ওঠার সময় ঘুম না ছাড়তে চাইলে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় লম্বা দম নাও। অতঃপর নাক-মুখ চেপে ধর। অতঃপর যখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ছট্ফটানি অবস্থা সৃষ্টি হবে, তখন নিঃশ্বাস ছাড়। এতে নিমেষে তোমার ঘুম ও আলস্য উভয়ই দূর হয়ে যাবে।

দিবানিদ্রা ভালো নয়। অবশ্য দিবানিদ্রার মানুষ তিন প্রকার; সদাচারী, ক্ষতিগ্রস্ত ও আহাম্মক। দুপুরের ঘুম সদাচার, সকালের ঘুম ক্ষতিকর এবং বিকালের ঘুম আহাম্মকী।

বলা বাহুল্য দুপুরে একটু রেষ্ট নেওয়ার বড় গুরুত্ব আছে। ভাত খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে একটু রেষ্ট্ নিলে শরীর তরোতাজা হয়ে ওঠে এবং বাকি দিনের কাজগুলো খুবই স্ফূর্তির সাথে করা যায়।

এ ব্যাপারে ইসলামে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা দুপুরের সময় বিশ্রাম নাও। শয়তানরা এ সময় বিশ্রাম নেয় না।" *(ত্বাবারানী, আবূ নুআইম, সহীহুল জামে' ৪৪৩১নং)*

'বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।'

পরীক্ষায় ভালো ফল করতে

এতদিন তুমি কি পড়লে, কেমন পড়লে ও বুঝলে, তা মনে আছে কি না ইত্যাদি দেখে নেওয়ার জন্য, কোর্সের বিষয়বস্তু ছাত্রের মর্মমূলে গেঁথে দেওয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে তোমার মান কোন্ পর্যায়ে তা বিচার করার জন্য মাঝে মাঝে পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরীক্ষায় ভালো ফললাভের জন্য কয়েকটি কাজ করতে হবে; যা নিম্নরূপ ঃ-

১। পরীক্ষার নাম শুনে ঘাবড়ে যাবে না। পরীক্ষার নাম শুনে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। এ কথা ঠিক যে,

عند الامتحان، يكرم الرجل أو يهان.

অর্থাৎ, পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত হয় অথবা লাঞ্ছিত।

এ কথা সত্য হলেও, তুমি সম্মানিত হবেই -এই আশা করবে। কোন কোন টিচার বা মুদার্রিসের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ভয় খাবে না। কারণ যে ভয় খায়, তাকে আরো বেশী ভয়ে ধরে। আর জানো তো, 'লজ্জা নিদ্রা ভয়, বাড়ালে পরেই হয়।'

তাছাড়া যে চোর, সেই পুলিশ দেখে ভয় পায়। আর যে পুলিশের সামনে ভয় পায়, সেই বেশী ধরা পড়ে। তুমি যদি পড়াশোনা করে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পার, তাহলে পরীক্ষাকে ভয় করবে কেন? বরং পরীক্ষা এলে তোমার আনন্দ হওয়া উচিত। যেহেতু তাতে তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, তাতে তুমি সম্মানিত হবে এবং উপহার লাভ করবে।

আর জেনে রাখ যে, পরীক্ষার আগে নার্ভাস হয়ে গেলেই মুখস্থ পড়াও ভুলে যাবে।

২। পরীক্ষায় ভালো ফললাভের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট কর। অর্থাৎ, তুমি যত নম্বর তুলতে চাও ঠিক তত নম্বরের কল্পনা বারবার তোমার মনছবিতে দেখতে হবে। ৯০, ৯৫ অথবা ১০০ পার্সেন্ট যেটাই আশা ও লাভ করতে চাও, সেটাই বারবার মনের মাঝে কল্পনা করতে থাক। মনের মধ্যে 'যদি'কে স্থান দিও না। অর্থাৎ, এমন ভেবো না যে, ৯০ না পেলে যেন ৮০ পাই, ৮০ না পেলে ৭৫ তো পাবই। বরং নিশ্চিতের সাথে আত্মপ্রত্যয় ও সুধারণা রেখে মনে মনে বল, ১০০ পার্সেন্টই পাব ইনশাআল্লাহ। তাহলেই দেখবে তাই পাবে।

৩। পড়াশোনায় অখন্ড মনোযোগ সৃষ্টি কর। সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে পড়া পড়তে হবে। মনের ভিতরে এই আস্থা রাখতে হবে যে, তুমি যা পড়বে তাই মনে থাকবে এবং পরীক্ষাগারে হুবহু তাই লিখতে পারবে।

৪। সময়ের সদ্ব্যবহার কর। অর্থাৎ, পরীক্ষার আগে মোটেই সময় নষ্ট হতে দিবে না। এই সময় কোন প্রকার বিনোদনে মন দিবে না। তাতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যেমন কোন উৎসব বা কারো বিয়েতে মাতামাতি করা, ইন্টারনেট খোলা, টিভির সামনে বসে কোন ফিল্ম্ ইত্যাদি দেখা থেকে দূরে থাক।

অবশ্য ব্রেনকে রেস্ট্ দেওয়ার জন্য হাওয়া খেতে যাও এবং সময় ও প্রয়োজন মত খেতে ও শুতে ভুলে যেও না।

৫। পরীক্ষার আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নাও।

পরীক্ষার এক মাস আগে পুরনো পাঠের পুনরালোচনা (মুরাজাআহ) শুরু কর। সহপাঠীদের সাথে মুযাকারাহ কর। যাতে প্রত্যেক বিষয় অন্ততঃপক্ষে একবার করেও মুরাজাআহ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিষয়ের মেন মেন পয়েন্ট্ নোট কর।

এক সপ্তাহ আগে মুখস্থ (হিফ্য) করার বিষয় মুখস্থ করতে শুরু কর।

অতঃপর যেদিন যে বিষয় থাকবে, সেদিন সে বিষয় ভালোভাবে মুরাজাআহ ও মুখস্থ কর। কোন্ কোন্ বিষয় পরীক্ষায় আসতে পারে তা অনুমান করে বারবার গুরুত্বের সাথে পড়।

পরীক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বে পয়েন্টগুলোর উপর শেষ বারের মত একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

৬। পরীক্ষার হলে বসে হাতে কোয়েশ্চন (প্রশ্নপত্র) এলে তা ভালো করে একবার পড়ে নাও এবং প্রশ্ন ভালোভাবে বুঝে নাও। প্রশ্ন বুঝতে কিন্তু ভুল করো না।

অতঃপর দ্বিতীয়বার পড়ে যেগুলোর উত্তর সহজ মনে হয় অথবা সুস্পষ্ট মুখস্থ আছে সেগুলো লিখে ফেল। তারপর যেগুলো অস্পষ্ট বা আবছা মনে আছে সেগুলোও লিখে নাও। মনকে স্থির করে ধীরভাবে স্মরণ করার চেষ্টা কর। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর মোটেই মনে আসছে না অথবা সন্দেহ লাগছে সেগুলোরও উত্তর আমভাবে আন্দাজে লিখে ফেল। উত্তর না লিখে ফেলে রেখো না। এতে অনেক সময় সঠিক উত্তর চলেও আসে।

বাকী প্রশ্নের উত্তরগুলো মনে আসছে না দেখে চট্ করে খাতা জমা দিয়ে চলে এসো না। বরং নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত বস এবং শান্তভাবে মনে করার চেষ্টা কর। যা আপাততঃ মনে আসছে না, তা কিছু পরে মনে আসতে পারে।

খাতা জমা দিতে তাড়াহুড়া না করে সবশেষে গোটা খাতা একবার মুরাজাআহ (রি-চেক বা রিভাইজ) করে নাও এবং কোথাও কিছু ভুল থাকলে তা সংশোধন করে ফেল। ভালোভাবে লক্ষ্য করে প্রশ্নপত্রের সাথে উত্তরপত্র মিলিয়ে দেখ, কোন প্রশ্নের কোন অংশের উত্তর দিতে ছুটে গেছে কি না।

গতকালের পরীক্ষা যদি কোন প্রকার খারাপ হয়েই থাকে, তাহলে সেই দুশ্চিন্তায় আজকের পরীক্ষার ক্ষতি করো না। বরং যা হয়েছে তা কাল বয়ে গেছে, আজকের পরীক্ষা সুন্দর করার অভিনব প্রস্তুতি নাও।

পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন মনে হলে, তা তোমার পড়াশোনায় শৈথিল্যের কারণে। তাতে মুদার্রিস বা শিক্ষকের দোষ থাকতে পারে না। তিনি তো কোর্স বাইরে প্রশ্ন করতে পারেন না। অতএব সে ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষকের প্রতি কুধারণা রেখো না, তাঁকে গালি দিও না, তাঁর গীবত করো না।

পরীক্ষায় আত্মপ্রত্যয় রাখবে এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করবে।

অতঃপর নিজের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করবে। খবরদার! অন্য কারোর উপর, চিটের চিরকুটের উপর অথবা অন্য কোন প্রকারের ধোকাবাজীর উপর ভরসা করবে না।

পরীক্ষা তোমার পড়াশুনার মান নির্ণয় করে। সেখানে ধোকাবাজী করে নিজের পজিশন উঁচু করা মানেই নিজেকে এবং কর্তৃপক্ষকে, অভিভাবককে এবং অন্যান্য মানুষকে ধোকা দেওয়া।

নকল করে বা অপরের দেখে উত্তর লিখার আশায় থাকবে না। অন্ধ অনুকরণে সে উত্তর সঠিক নাও হতে পারে। তাছাড়া এমন দেখাদেখি উত্তর লিখাও একটি অন্যায়। আর যে দেখায় সেও অন্যায়ে শরীক হয়। তুমিও অপরকে দেখাবে না। মানবিকতার খাতিরে অপরের সহযোগিতা করে অপরের জীবন বরবাদ করো না। শিক্ষক বা গার্ডের জন্যও বৈধ নয়, চিট করা দেখে চুপ করে থাকা। কারণ,

'অন্যায় যে করে ও অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

তদনুরূপ নিজের জায়গায় অপরকে পরীক্ষায় বসিয়ে ভালো রেজাল্ট্ করা এবং তার মাধ্যমে একটি জাল সার্টিফিকেট অর্জন করার মাঝে কোন সার্থকতা নেই; বরং তাতে আছে অভিশাপ।

কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার মানেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। পরীক্ষায় নকল করার মানেই, আত্মহত্যা করা।

আর আমাদের মহানবী ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

"যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে (মানুষকে) ধোকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০১নং)*

"যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)*

তুমি শিক্ষিত তওহীদবাদী এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। কোন বিষয়ে কুসংস্কার তোমার মনে স্থান পাওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার ব্যাপারেও নয়। সুতরাং পরীক্ষার ভীতি দূর করতে অথবা ভালো ফল লাভ করতে কোন গায়রুল্লাহর কাছে আশা ও আবেদন রেখো না। অবশ্য বড়দের নিকট দুআ চাইতে পার।

ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের মত গোল নম্বর বা শূন্য পাওয়া যায় -এমন ধারণা রাখার কি কোন যৌক্তিকতা আছে?

পরীক্ষার পূর্বে যেমন শিক্ষকদের জন্য উচিত নয়, ছাত্র-ছাত্রীকে অতিরিক্ত ভয় দেখানো, তেমনি অভিভাবকেরও উচিত নয়, অতিরঞ্জিত শাস্তির কথা ঘোষণা করে ছেলেমেয়েকে অধিক হতাশার দিকে ঠেলে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সকলের উচিত হল, তাদেরকে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে আশাবাদী করে তোলা।

ছেলেমেয়ের প্রতি অভিভাবকের কর্তব্য কেবল পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করা এবং অন্যান্য সময় তাদের পড়াশোনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা একটি বড় তরবিয়তী ভুল। অভিভাবকের উচিত, সর্বদা তাদের পড়াশোনার খেয়াল রাখা।

অনেক অভিভাবক আছেন, যাঁরা কেবল নিজেদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার রেজাল্টই দেখেন এবং তাদের আদর্শ ও চরিত্রগত দিকটা তাকিয়েও দেখেন না। তাঁরা তাদের সার্টিফিকেট ও চাকরির যোগ্যতা দেখেন এবং শিক্ষার আসল সুফল দর্শন করতে চান না। তাঁরা তাদেরকে শিক্ষিত দেখতে চান; কিন্তু তারা মানুষ হয়েছে কি না তা দেখতে চান না। আর নিঃসন্দেহে এটা তাঁদের বড় ভুল।

পরিশেষে বলি যে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট্ করলে তোমার মহান প্রতিপালক আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করো। কারণ, কৃতজ্ঞতায় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর এ পরীক্ষার সাথে কবরের পরীক্ষার কথা স্মরণ করো, যার প্রশ্ন আউট হয়ে আছে। সুতরাং কবর ও হাশরের পরীক্ষায় যেন পাশ করতে পার তার চেষ্টা রেখো।

পরীক্ষাই শেষ কথা নয়। পরীক্ষার পরেও নিয়মিত দুআ, নামায ও পড়াশোনা বজায় রেখো। কিছু ছাত্র আছে, যারা পরীক্ষা শেষ হলে অনেকে স্বস্তির শ্বাস নেয়। পরীক্ষা ও চাকরির পর সব ভুলে যায়। ভুলে যায় পঠিত বিষয় এবং

অনেকে ভুলে যায় আল্লাহকেও। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুক।

'কি এক আশে পড়ছিল নামায, আশা পুরিল তার,
আর রোযা নেই তাহার পরে নামায হইল ভার!'

হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না।

ছাত্র জীবনে কতিপয় জরুরী দুআ

দুআ বা প্রার্থনা মুসলিমের অস্ত্র স্বরূপ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে চাইলে পাওয়া যায়। তুমি তোমার প্রয়োজন তাঁর কাছে চাও, তুমিও পাবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস।

জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি করার দুআ

১। {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } (١١٤) سورة طـــه.

উচ্চারণঃ- রাব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা।

অর্থঃ- হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(সূরা ত্বাহা ১১৪ আয়াত)*

২। اَلــلّــهُمَّ فَـــــقِّـــــهْــنِيْ فِي الدِّيْـــنِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ফাক্বক্বিহনী ফিদ্দীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর। *(বুখারী ১/৪৪, মুসলিম ৪/১৭৯৭)*

৩। اَللّهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْماً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মানফা'নী বিমা আল্লামতানী অ আল্লিমনী মা য়্যানফাউনী অযিদনী ইল্‌মা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার

ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৭)*

৪। اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআ, অ আউযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট উপকারী শিক্ষা প্রার্থনা করছি এবং যে শিক্ষা কোন উপকারে আসে না, সে শিক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৭)*

৫- اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّرِزْقاً طَيِّباً وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযে সালাম ফিরার পর এটি পঠনীয়। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৫২, ত্বাবারানীর সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১১১)*

পড়াতে সাবলীলতা চাইতে

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي.

উচ্চারণ ঃ- রাব্বিশরাহ লী স্বাদরী, অয়্যাস্‌সির লী আমরী, অহলুল উক্বদাতাম মিল লিসানী, য়্যাফক্বাহু ক্বাউলী।

অর্থঃ- হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কর্ম সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। *(সূরা ত্বাহা ২৫-২৮ আয়াত)*

অলসতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি থেকে আশ্রয় চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَال۔ -১

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্‌নি অল আজ্‌যি অল কাসালি অল বুখ্‌লি অল জুব্‌নি অ য়্যালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ৭/ ১৫৮)*

اَللّٰهُمَّ لاَسَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً۔ -২

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা। অআন্তা তাজআলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা সহজ করে দিয়েছ তা ছাড়া সহজ কিছু নয়। আর ইচ্ছা করলে তুমিই দুশ্চিন্তাকে সহজ করে থাক। *(ইবনে হিব্বান, ইবনে সুন্নী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮৬নং)*

وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত